ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম : ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬৩ বর্ষ ২ সংখ্যা ।। ২৭ ভাদ্র ১৪১৭ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১২) ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১০ ।। Website : www.eswastika.com

শুধু চীনের সৈন্য সমাবেশই নয়, পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে ভারত বিরোধিতায় একাধিক চীনা প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি।। পাক-অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে অবাঞ্ছিত মন্তব্য করার পাশাপাশি সেখানেই এবার একাধিক প্রকল্প রূপায়ণের পথে এগোচ্ছে চীন। বলাই বাহুল্য, চীনের ভারত-বিরোধিতা কেবলমাত্র আর মৌখিক স্তরে সীমাবদ্ধ নেই, তা এখন কার্যকরী স্তরে উন্নীত হয়েছে। গোয়েন্দা-সূত্রে দেশের কেন্দ্রীয় সরকারকে ইতিমধ্যেই অবগত করা হয়েছে যে পাক-অধিগৃহীত কাশ্মীরের ঠিক পাশেই গিলগিট এবং বালতিস্তানে বিপুল সংখ্যায় চীনের সেনাবাহিনীকে জড়ো করা হয়েছে। এবং সেখানকার দুর্গম এলাকায় তাদের পায়ের ছাপের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান দেখে অদূর ভবিষ্যতে ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণের মহড়া এখন থেকেই চীনের সাহায্যে পাকিস্তান সেরে রাখতে চাইছে বলে গোয়েন্দাদের আশঙ্কা। সেই আশঙ্কায় ইন্ধন যুগিয়েছে পাক-অধিগৃহীত কাশ্মীরে একাধিক চীনা-প্রকল্প। সাউথ-ব্লক হিসেব করে দেখেছে গিলগিট-বালতিস্তান সহ পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে অন্তত ১৭টি চীনা-প্রকল্পের কাজ চলছে পুরোদমে। ভারতের পক্ষে সবচেয়ে উদ্বেগের কারণ চীনের এই প্রকল্পগুলো সবই পাকিস্তানের তত্ত্বাবধানে হচ্ছে। ১২২টি চীনা-কোম্পানী ওই প্রকল্পগুলোতে অংশ নিয়েছে। সেইরকম কিছু প্রকল্প হলো—

কারাকোরাম হাইওয়ে সম্প্রসারণ : চীনা রোড এবং ব্রীজ কর্পোরেশন এই প্রকল্পের একমাত্র অংশীদার এবং ইতিমধ্যেই তারা চীনের এক্সিম ব্যাঙ্কের মাধ্যমে এর জন্য ৩২.৭ কোটি ডলার ব্যয় করেছে। সম্পূর্ণ

প্রকল্পটিতে খরচ পড়ছে প্রায় ৪৯.১ কোটি ডলার। এছাড়াও কারাকোরাম হাইওয়েতে ডবল-লেন তৈরির জন্য এবং জাগলট-স্কার্দু রোড প্রশস্ত করবার জন্য দু'টি পৃথক মৌ-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

পাকিস্তান-চীন রেলপথ : হাভেলিয়ান এবং খুনজেরাব পাস-এর (গিরিপথ) মধ্যবর্তী অঞ্চলে কারাকোরাম হাইওয়েকে ধরেই ৭৫০ কিমি দীর্ঘ রেলপথ গড়ে উঠতে চলেছে। পাকিস্তান-চীনের 'জয়েন্ট ভেঞ্চারে' হওয়া এই প্রকল্পে পাকিস্তান রেলওয়েজ এবং চীনের ডংফ্যাং ইলেকট্রিক কর্পোরেশনের ভূমিকা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

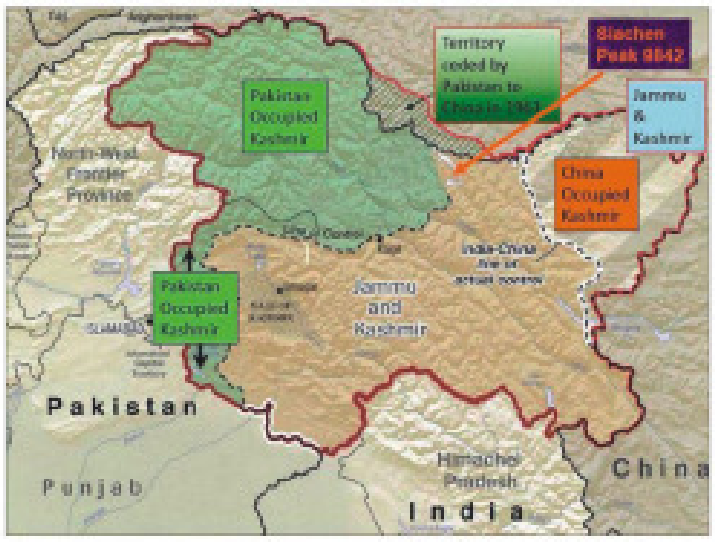

ঝিলম ব্রীজ : একটি চাইনিজ রাস্তা কোম্পানীকে প্রায় ১২ কোটি টাকা খরচ করে মীরপুর জেলায় ধামানিতে ঝিলম নদীর ওপর সেতু তৈরির বরাত দিয়েছে পাক-সরকার।

গিলগিট-স্কার্দু রোডে পাঁচটি ঝুলন্ত অস্থায়ী সেতু : চীনের জিনজিয়াং রোড এবং ব্রীজ কনস্ট্রাকশান কোম্পানী ১৬৭ কিমি দীর্ঘ পাঁচটি ঝুলন্ত অস্থায়ী সেতুকে কৌশলগতভাবে তাদের দেশ থেকে পাকিস্তানের গিলগিট-স্কার্দু রোডে স্থানান্তরিত করেছে।

খনি : এম সি সি রিসোর্স ডেভলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড নামে একটি চীনা কোম্পানী গিলগিট-বালতিস্তান এলাকায় খনিজ খননের কাজ চালু করে দিয়েছে। সেখানকার প্রাদেশিক সরকারের পূর্ণ সম্মতিতে এ কাজ চলছে। এর জন্য পাকিস্তান সারপাস মাইনিং কোম্পানী গঠিত হয়েছে চীনের জিনজিয়াং সারপাস মাইনিং কোম্পানী লিমিটেডের উদ্যোগে। এই প্রকল্পে তারা ব্যয় করছে প্রায় ৬০ কোটি ডলার।

সাস্ট ড্রাই বন্দর : কারাকোরাম হাইওয়ের ওপর গিলগিট থেকে প্রায় দু'শো কিমি দূরে দু'দেশের যৌথ উদ্যোগে গড়ে ওঠা পাক-চীনা সাস্ট পোর্ট কোম্পানীর উদ্যোগে গড়ে উঠছে সাস্ট ড্রাই বন্দর। প্রসঙ্গত বছর চারেক আগে নির্মিত ওই কোম্পানীটির অধিকাংশ শেয়ারই চীনের।

মোবাইল কমিউনিকেশান লিঙ্ক : চীন

(এরপর ৪ পাতায়)

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জয়ী এ বি ভি পি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ৬ সেপ্টেম্বর শহীদ মিনারে রাহুল গান্ধীর আগমনের দিন সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছিল যুব-সমাজের নবি (প্রফেট) বঙ্গদেশে পদার্পণ করেছেন (কোনও কোনও চ্যানেল আবার মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহে স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকা প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে একে তুলনা

করেছিল।) কিন্তু সংবাদ-মাধ্যমের ঘোষিত যুব সমাজের এই নবিটিকে যে যুব-সমাজ একেবারেই পুঁছছেন না তার প্রমাণ মিলল গত ৪ সেপ্টেম্বর, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনে। সেখানকার সদ্য-সমাপ্ত ছাত্র-সংসদ নির্বাচনে চারটি পদাধিকারীর মধ্যে তিনটি পদাধিকারী নির্বাচনেই বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের প্রার্থীরা। ছাত্র-সংসদের সভাপতি পদে এ বি ভি পি-র জিতেন্দ্র চৌধুরী তাঁর মূল

(এরপর ৪ পাতায়)

সঙ্কটের মুখে সংসদ ভবনের বিরল ঐতিহাসিক চিত্র, উদ্যোগ পুনরুদ্ধারের

নিজস্ব প্রতিনিধি।। নিউ দিল্লীর সংসদ ভবনের বাইরে গোল দেওয়ালের শোভা বাড়াতে ঠাঁই হয়েছিল ৫৮টি ঐতিহাসিক ছবির। কিন্তু ভবনের শোভা বাড়ালেও প্রশাসনের উদাসীনতার শিকার হতে হয়েছে ছবিগুলোকে। ফলে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে প্রায় নষ্ট হয়ে যেতে বসেছিল ৫ হাজার বছরের ভারতীয় ইতিহাসের সাক্ষ্যবহনকারী অমূল্য সব ছবিগুলো। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে অজানা থেকে যাচ্ছিল ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল একটি অধ্যায়।

কিন্তু ইংরাজিতে একটা প্রবাদ বাক্য আছে— 'বেটার লেট দ্যান নেভার।' তাই ছবিগুলোকে সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে এসেছে জাতীয় সংগ্রহশালা (ন্যাশনাল মিউজিয়াম)।

এই কাজের গুরু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কনজারভেশান অফ দ্য ন্যাশনাল মিউজিয়াম

দেওয়ালে আঁকা একটি ছবি।

ইনস্টিটিউট অফ হিস্ট্রি অ্যান্ড আর্টের অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও বিভাগীয় প্রধান আই কে ভাটনগরকে। ভাটনগরের এই কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তার পাঁচজন সহযোগীও। তারা জানান, দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার কারণেই আই কে ভাটনগরকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কাজটা সম্পূর্ণ হতে সময় লাগবে প্রায় ৭ মাস। ছবিগুলোকে পুনরুদ্ধার করার ক্ষেত্রে রাসায়নিক পদ্ধতির ব্যবহার করা হবে বলেও জানালেন ভাটনগরের একজন সহযোগী। একটি ইংরাজী দৈনিকে শ্রী ভাটনগর এই বিষয়ে বলেন, 'ছবিগুলো নষ্ট হয়েছে ভবনের সাফাই কর্মীদের গাফিলতির কারণে। ৫৮'টির মধ্যে প্রায় ২৮টা ছবির অবস্থা বেশ সঙ্কটজনক। ১২টা ছবিকে ভবন থেকে স্থানান্তরিত করে মেরামত করতে হবে। তবে ছবিগুলো যাতে অল্প সময়ের মধ্যে ভবনের দেওয়ালে পুনরায় প্রতিস্থাপিত করা যায়, সেই ব্যাপারেও নজরে দেওয়া হবে।"

(এরপর ৪ পাতায়)

দেগঙ্গায় মুসলিম তাণ্ডব

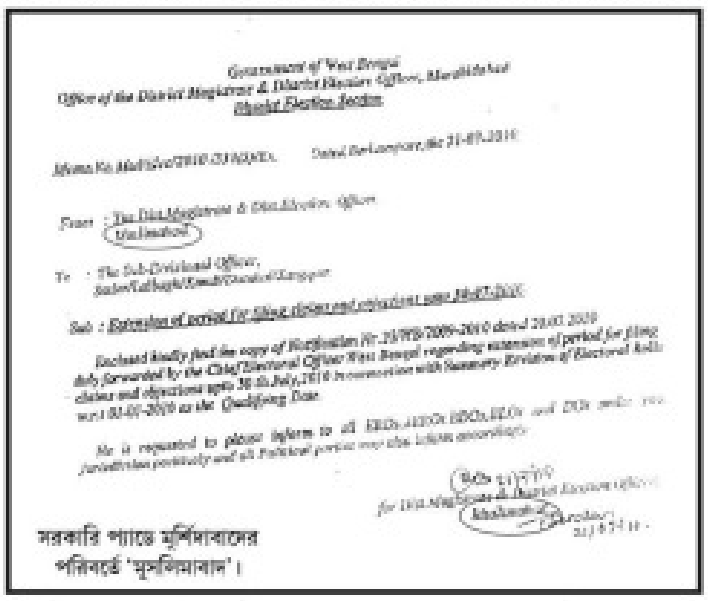

নিজস্ব প্রতিনিধি।। উত্তর ২৪ পরগণার দেগঙ্গা এখন থমথমে। ইতিমধ্যে পুড়েছে ৫০-এর বেশি বাড়ি ও দোকান। আক্রান্ত হয়েছে পুলিশ। জারি হয়েছে ১৪৪ ধারা। নেমেছে সেনা। ঘটনার সূত্রপাত স্থানীয় একটি পূজাকে কেন্দ্র করে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য অনুযায়ী দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল তৈরিতে বাধা দেয় মুসলিম যুবকরা। তাদের যুক্তি হলো ওই প্যান্ডেলের জায়গা নাকি এখন থেকে কবরস্থান। সুতরাং ওখানে পূজা হবে না। এলাকার হিন্দুরা এই ধরনের গাজোয়ারির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোয় মুসলিম দুষ্কৃতীরা সন্ধ্যা নাগাদ ইফতার পার্টি সেরে সংগঠিতভাবে হিন্দুদের মন্দির, দোকান-ঘর ভাঙচুর চালায় এবং বেছে বেছে হিন্দু মা-বোনেদের শ্লীলতাহানি করে। ঘটনাস্থল কার্তিকপুর থেকে উত্তেজনা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে থাকে বারাসতের বেলিয়াঘাটা ও দেগঙ্গা বাজার এলাকায়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তথাগত রায়ের নেতৃত্বে বিজেপির এক প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গেছেন।

মুসলিম তোষণ নীতির সুযোগ নিচ্ছে সন্ত্রাসবাদীরা

গুরুপুরুষ।। বিধানসভার নির্বাচনে মুসলিম ভোট ব্যাঙ্কের দখল নিতে মরিয়া সিপিএম এবং কংগ্রেস-তৃণমূলের বিরোধী জোট যেভাবে মুসলিম তোষণ নীতি নিয়েছে তার পুরো সুযোগ নিচ্ছে ভারত বিরোধী জেহাদি সন্ত্রাসবাদীরা। এই রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি মুর্শিদাবাদ জেলাকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত করার ষড়যন্ত্র করেছে। মুর্শিদাবাদকে বিচ্ছিন্ন করলে দার্জিলিং সহ উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলাই বিপন্ন হবে। অসম সহ উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলি সড়ক পথে দেশের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ হারাবে। ভারত বিরোধী

Government of West Bengal
Office of the District Magistrate & District Election Officer, Murshidabad
District Election Section

সরকারি প্যাডে মুর্শিদাবাদের পরিবর্তে 'মুসলিমাবাদ'।

সন্ত্রাসবাদীদের দৃষ্টিতে তাই মুর্শিদাবাদ জেলার অবস্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেশভাগের সময় মুর্শিদাবাদকে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করার চক্রান্ত হয়েছিল। সেই চক্রান্তকে রুখে দেন পুরুষ সিংহ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

মুর্শিদাবাদ জেলাকে বিচ্ছিন্ন করার গোপন ষড়যন্ত্র যে চলছে তার স্পষ্ট প্রমাণ জেলা শাসকের দপ্তর থেকে মহকুমা শাসকদের কাছে পাঠানো সরকারি চিঠি। ভোটার তালিকায় নাম তোলার সময়সীমা ৩০ জুলাই পর্যন্ত বর্ধিত করার

(এরপর ৪ পাতায়)

চার্চের মদতেই অশান্ত জঙ্গলমহল

উত্তম মাহাতো ঃ পুরুলিয়া।। দক্ষিণ বাংলার তিন জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া শাল, পিয়াল, মহুল ও পলাশে ঘেরা। এই তিন জেলাকে নিয়ে জঙ্গলমহল বলে যে এলাকা পরিচিত তা আজ বাম সরকারের বঞ্চনার শিকার। বেশির ভাগ মাহাতো ও সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বাস। গত বেশ কয়েক বছর ধরেই এই এলাকাগুলিতে খৃস্টান মিশনারীরা তাদের ধর্মান্তরকরণের কাজ থেকে পিছু হটেছে। বনবাসী কল্যাণ আশ্রম যেভাবে স্থানীয় জনজাতিদের মধ্যে সামাজিক সচেতনতার কাজ করে চলেছে তাতে মিশনারীরা তাদের কাজে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ধর্মান্তরকরণের পথ পরিবর্তন করে জঙ্গলমহলকে অশান্ত করে তুলতে চাইছে।

উল্লেখ্য, পশ্চিমবাংলার এই তিন জেলাকে নিয়ে বৃহৎ ঝাড়খণ্ড ল্যাণ্ড-এর দাবি এবং ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার অভ্যুত্থান ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে যাচ্ছে। এই আন্দোলনও কিন্তু পরিচালনা হোত রাঁচীর চার্চ থেকে। গত কয়েক বছর ধরে ঝাড়খণ্ড রাজ্যে ধারাবাহিকভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি তাদের অবস্থান অক্ষুন্ন রাখতে পারায় ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা পার্টি ধরাশায়ী হয়েছে। তাই খৃস্টান মিশনারীরা বিদেশী বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির সাথে হাত মিলিয়ে ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড় তথা পশ্চিমবাংলার এই তিন জেলায় মাহাতো ও সাঁওতাল সম্প্রদায়ভুক্ত যুবকদের সামনে মাওবাদী ও জনসাধারণের কমিটি নামে নয়া ফোরাম তৈরি করেছে এবং নিরিবিলি, শান্ত, শাল মহুয়ায় ঘেরা জঙ্গলে বসবাসকারি স্থানীয় সরল ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিভেদ তৈরির চেষ্টা করছে। একই সম্প্রদায়ের হওয়া সত্ত্বেও শুধু রাজনৈতিক রঙের ভিন্নতার কারণে একে অপরকে হত্যা করে নিজেদেরই ধ্বংসে ডেকে আনছে। চীনের কূট পরিকল্পনায় ভারতকে পঞ্চাশ টুকরোতে ভাগ করার কাজকে ত্বরান্বিত করছে। এবং এই শক্তিকে মুসলিম মৌলবাদী শক্তি, অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে পুষ্ট করছে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় মিশনারী শক্তির মদত ক্রমশ জঙ্গলমহলের উত্তপ্ত পরিস্থিতিকে দাবানলে পরিণত করার দিকে নিয়ে চলেছে।

অথচ ৩৩ বছরের বাম শাসনে এই জঙ্গলমহলের কোনও উন্নয়ন হয়নি। রাজনৈতিক দাদাদের স্নেহধন্য কালোবাজারি ব্যবসায়ীর হাত ধরে জঙ্গলমহলের কাঁচা শালগাছ, শালপাতা, কেন্দুপাতা, খনিজ পাথর ঔষধি গাছ চোরাপথে বাহিরে চলে যাওয়ার জন্য জঙ্গলবাসী উপযুক্ত মজুরী পাচ্ছে না। পুরুলিয়া জেলার মানবাজার, বরাবাজার, বান্দোয়ান; বাঁকুড়ার বারিকুল, রাণীবাঁধ; মেদিনীপুরের বেলপাহাড়ী, বাঁশপাহাড়ী এলাকাতে টমাটো ও বেগুন চাষ করলেও উপযুক্ত দাম না পাওয়ায় বা সরকারের কোনও বিশেষ পরিকল্পনা না থাকায় চাষীরা মার খাচ্ছে। গত চল্লিশ বছর আগে কুমারী ও কংসাবতী নদীর উপরে দক্ষিণ বাঁকুড়াকে শস্যশ্যামল করার জন্য মুকুটমণিপুরে যে বাঁধ দেওয়া হয়েছে, বামশাসিত সরকার বাঁধ সংস্কার না করার ফলে জল ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। ফলে বিস্তীর্ণ এলাকার চাষিদের হাতে কোনও কাজ নেই— বিকল্প কাজের ভাবনাও নেই।

উল্লেখ্য, এই ছোটনাগপুরের বসবাসকারী মাহাতো সম্প্রদায়ভুক্ত ছেলেরা তাদের বাপ-ঠাকুর্দার কাছে শুনেছে—ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের যে লড়াকু মাওয়ালী সেনা, যারা মুসলিম শাসনের হাত থেকে দেশে হিন্দু স্বরাজ স্থাপনের সেনানী হিসাবে নিজেদের জীবন বিসর্জন করতেও পিছপা হননি, তারা তাদেরই বংশধর। পাহাড়ে জঙ্গলে বসবাস করাটাই তাদের পছন্দ— কারণ তারা প্রকৃতি পূজারী। গাছ, পাথর, পাহাড়কে পূজা করে, তাদের উৎসব—গরাম, ছাতা, জিতা, করম এই সবই প্রকৃতির পূজা। অথচ এই প্রকৃতিপ্রেমকে ভুল ব্যাখ্যা করে জনজাতিদের বলা হচ্ছে, তোমরা মূর্তি পূজা করো না। হিন্দুরা মূর্তি পূজাতে বিশ্বাসী, তাই তোমরা হিন্দু নও, তোমাদের ধর্ম সারনা— এই ভাবে সহজ, সরল, শক্তিমান ভক্তিমান মাহাতো ও সাঁওতাল মূল হিন্দুধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করার নতুন পথ করে দিচ্ছে মাওবাদী এবং তাদের তৈরি জনসাধারণের কমিটি। ফলে নিজেদের মধ্যে মারামারি, কাটাকাটি করে এক মাহাতো অন্য মাহাতোকে, এক সাঁওতাল অন্য সাঁওতালকে মেরে ফেলছে। নিজেরা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ করে এই বিরাট জনশক্তি রাষ্ট্রবিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির হাত শক্ত করেছে।

মূল্যবৃদ্ধির কবলে ভগবানও, প্রতিবাদ পূজারীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি।। সারাদেশ যখন রামজন্মভূমি নিয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের দিকে তাকিয়ে রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষায় দিন গুনছে, ঠিক তখনই নিজেদের দাবী নিয়ে অযোধ্যার অস্থায়ী রামলালা মন্দিরের পূজারীরা শরণাপন্ন হলেন সরকারের কাছে। কেননা এখন মন্দির পরিচালন কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে রয়েছেন ফৈজাবাদের কমিশনার! স্থানীয় সূত্রানুযায়ী, ১৯৯২ সালে ৬ ডিসেম্বরের ঘটনার পরদিনই অস্থায়ীভাবে নির্মাণ করা হয় মন্দিরটি। সেসময় মন্দিরের পূজা-অর্চনা ও কাজকর্মের জন্য নিয়োগ করা হয় ১ জন মুখ্য পুরোহিত সহ ৪ জন সহকারী পুরোহিত ও ৪ জন সহযোগীকে। তখন থেকেই নিয়মিতভাবে চলে আসছে রামলালার পুজো। ব্যবস্থা আছে নিয়মিত ভোগ এবং সন্ধ্যা আরতিরও। প্রতিদিন ভক্তের ঢল নামে মন্দির প্রাঙ্গণে। কিন্তু এত কিছুর পরেও ভগবানের পুজো আজ সঙ্কটের মুখে। কিন্তু কেন? কারণ মূল্যবৃদ্ধি। বর্তমানে জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির দরুণ সাধারণ মানুষের সঙ্গে শিকার হয়েছেন রামলালা স্বয়ং। ফলে মন্দিরের পূজারীদের পুজো বন্ধ রেখে সরব হতে হয়েছে বেতনবৃদ্ধির দাবিতে। এই বিষয়ে মন্দিরের মুখ্য পূজারী সত্যেন্দ্র দাস বলেন, "প্রতিমাসে পুজো বাবদ মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৪৩৬০০ টাকা দেওয়া হয়। টাকাটি দেন ফৈজাবাদের কমিশনার। শুধু পুজো বা রক্ষণাবেক্ষণই নয়, মন্দিরের এক কর্মচারীর বেতনও দেওয়া হয় ওই ৪৩৬০০ টাকা থেকে। প্রতিমাসে প্রায় ২৩ হাজার টাকা ব্যয় করতে হয় কর্মচারীদের বেতনের জন্য। সাম্প্রতিক সময়ে মূল্যবৃদ্ধির প্রকোপ যেভাবে বেড়েছে, সেক্ষেত্রে ৪৩৬০০ টাকায় সবকিছু বজায় রাখা সত্যিই অসম্ভব হয়ে পড়ছে বলেও জানান তিনি। এই ব্যাপারে ফৈজাবাদ কমিশনারকে লিখিত আবেদনের কথাও স্বীকার করেন সত্যেন্দ্রনাথবাবু। মন্দিরের এক কর্মচারীর কথায় প্রতিমাসে ভক্তদের কাছ থেকে প্রায় দেড় লক্ষ টাকার দান সংগ্রহ করা হয়। এই দানের পুরো অর্থই চলে যায় সরকারের কোষাগারে। এখান থেকেই প্রধান পুরোহিতকে প্রতিমাসে ৪৩৬০০ টাকার চেক্ দেওয়া হয়।"

শুধু এবারেই নয়, এর আগেও মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ ও বেতনবৃদ্ধির দাবিতে মুখ খুলেছেন মন্দিরের কর্মচারীবৃন্দ। কিন্তু এখনও কোনও সদুত্তর পাওয়া যায়নি বলেও জানালেন মুখ্যপুরোহিত।

এই সময়

বিশ্বসেরা

কমনওয়েলথ গেমসের প্রাক্কালে আপামর ক্রীড়াপ্রেমীদের জন্য সুখবর। জয়ন্ত তালুকদার, তরুণদীপ রাই এবং রাহুল ব্যানার্জীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তীরন্দাজি বিশ্বকাপের স্টেজ ফাইভ-এ স্বর্ণপদক ছিনিয়ে আনল ভারত। গত ৪ সেপ্টেম্বর তাঁরা ফাইনালে হারালেন তিন জাপানী প্রতিপক্ষ রায়োতা আমানো, তকাহাক ফুরুকাওয়া এবং হিদেকল কিকুচি-কে। খেলার ফল ভারতীয়দের পক্ষে ২২৪-২২০। ভারত জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন নিলেও ক্রিকেটীয় মাইলেজের ধারে-কাছে পৌঁছতে পারেনি তীরন্দাজি। নেপথ্যে ভারতীয় মিডিয়ার কারসাজি। মিডিয়ার দৌলতে কমনওয়েলথ গেমসের দুর্নীতি যেভাবে জনমানসে প্রতিফলিত হয়েছে, তার ছিটেফোঁটাও যদি তীরন্দাজেরা পেত তবে তারা হয়তো বর্তে যেত। কিন্তু স্পোর্টস মিডিয়া যে খেলা কভারেজ করে না, কভারেজ করে পলিশ!

বাহ্ কি বুদ্ধি!

সত্যিই, কেন্দ্রীয় সরকারের বুদ্ধির তারিফ না করে পারা যায় না! একদিকে যখন অশান্ত কাশ্মীর উপত্যকা ঠিক তখনই সেখানকার শ্রীনগর এবং বাদগাম জেলা থেকে এ এফ এস পি এ (আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট) তোলার ইচ্ছা প্রকাশ করল কেন্দ্র এবং তাতে সায় দিয়েছে জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাও। গত ১১ জুন থেকে অশান্ত হয়ে উঠেছে কাশ্মীর। চীন থেকে পাকিস্তান— সেখানে ভারত বিরোধী কাজে মদতদাতা সবাই। কাশ্মীরে শান্তি ফেরাতে ভারতীয় সেনা-কে তো তাই সেখানে দরকারই। উপরন্তু এপর্যন্ত সেনার ভূমিকাও বেশ সফল। কিন্তু ক্ষমতা আঁকড়ানোর তাগিদে কেন্দ্রের কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ-র কাছে মুসলিম ভোট বড় বালাই। এক্ষেত্রে বামপন্থীরাও তাদের দোসর। তাই কাশ্মীরি মুসলিমদের সন্তুষ্ট করতে ভারতীয় সেনার মনোবল ভেঙে দিয়ে এ এফ এস পি এ প্রত্যাহার করতে চেয়ে কি বুদ্ধিরই (পড়ুন চরম নির্বুদ্ধিতা) না পরিচয় দিলেন সরকার বাহাদুর!

অক্ষরধাম হামলাকারীদের আবদার

সিবিআই তদন্তের দাবী জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের কাছে আবেদন পেশ করলো ২০০২ সালে গুজরাটের অক্ষরধাম মন্দির আক্রমণের সঙ্গে জড়িত যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত দুই আসামী। এই দু'জনের একজন হলো আদাম সুলেমান আজমারী, অপরজন আব্দুল কায়ুম। এছাড়া অক্ষরধাম মন্দির কাণ্ডে অভিযুক্ত আরও দু'জনকে ইতিমধ্যেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। আজমারী ও কায়ুমের বিরুদ্ধে তদন্তকারী অফিসার ছিলেন গুজরাট পুলিশের প্রাক্তন ডি এস পি ডি জি বানজারা। সোহরাবউদ্দিন কাণ্ডে কংগ্রেসী প্রতিহিংসামূলক রাজনীতির বলি হয়ে যিনি আপাতত জেলে। বানজারাকে জেলে পোরার মতো ঘটনা যত ঘটবে ততই সন্ত্রাসবাদীরা উৎসাহিত হবে বলে বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা। অক্ষরধাম হামলাকারীদ্বয়ের আবদার তারই ফলশ্রুতি।

সুখের দিনে ব্রাত্যজন

তখন সদ্য তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি হয়েছে। ১৯৯৮ এবং ১৯৯৯-এর লোকসভায় উপর্যুপরি ভাল ফল করা তৃণমূল নেত্রী সুদিন বলে যেটাকে ভেবেছিলেন, ভবিষ্যত সাক্ষী দিচ্ছে সেটা ছিল আসলে মরীচিকা। আর সেই মরুভূমির ওয়েসিস ছিলেন মহম্মদ রফিক। যাঁর সাফল্যে ভর করেই তৃণমূল নেত্রী স্লোগান তুলেছিলেন— 'কেশপুরই সিপিএমের শেষপুর।' এরপর রূপনারায়ণ দিয়ে বহু জল বয়ে গেছে। তৃণমূল নেত্রীর নয়নের মণি এখন শুভেন্দু অধিকারী, শিশির অধিকারীরা। আজ মমতার সত্যিকারের সুখের দিনে ব্রাত্য রফিক। তাঁর সঙ্গে তৃণমূল শিবিরের দুর্ব্যবহারের অভিযোগ এনে কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন করলেন তিনি।

ড্যানিশ কার্টুনিস্টকে পুরস্কার

এবার জেহাদিদের কোপে পড়তে চলেছেন জার্মান চ্যান্সেলর এঞ্জেলা মর্কেল। জেহাদিরা যে ড্যানিশ কার্টুনিস্টকে মহম্মদের কার্টুন আঁকার জন্য মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছিল তাকেই শ্রীমতী মর্কেল 'মিডিয়া পুরস্কার ২০১১'-এ সম্মানিত করতে চলেছেন। ৫৬ বছর বয়সী চ্যান্সেলর কার্টুনিস্ট কার্ট ওয়েস্টারগার্ডকে শীঘ্রই এক অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করবেন। তবে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা হচ্ছে— ব্যাপক নিরাপত্তা বন্দোবস্ত থাকছে। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা এবার হয়ত শ্রীমতী মর্কেলও জেহাদিদের টার্গেট হতে চলেছেন।

পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে গ্রীন কপস্

পরিবেশ দূষণ রুখতে এবার অগ্রসর হলো কর্ণাটকের বিজেপি সরকার। সম্প্রতি, রাজ্যে এই সমকালীন সমস্যার মোকাবিলায় সবুজ পুলিশবাহিনী বা গ্রীন কপস্ গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্ণাটক সরকার। এই বিষয়ে পরিবেশমন্ত্রী কৃষ্ণা পালেমার বলেন, শিল্পাঞ্চল রাজ্য হবার সুবাদে কর্ণাটকে পরিবেশ দূষণের আশঙ্কা একটু বেশিই। রাজ্যে প্রায় ৪০ হাজার হাসপাতাল ও ১০ হাজার কারখানা রয়েছে। সবুজ উর্দিপরা এই পুলিশবাহিনী বিভিন্ন খনিজ ও ইস্পাত কারখানার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে পরিবেশ রক্ষায় তাঁদের সচেতন করবেন। নিয়মের ফেরাটোপে বাঁধা হবে স্থানীয় বাসিন্দাদেরও।" মন্ত্রী আরও জানান, শুধু গ্রীন পুলিশ কর্মীরাই নন, এই সমস্যার বিরুদ্ধে সরকারের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে কর্ণাটকের রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। এছাড়া, পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত কোনও তথ্য রাজ্য নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কাছে পৌঁছে দিলেই, দেওয়া হবে পুরস্কার।

পাকিস্তানে হামলা আল-কায়দা-র

সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর পাকিস্তান ফের আরেকবার সন্ত্রস্ত। এবং সৌজন্যে আল কায়দা। গত ৩ সেপ্টেম্বর সেদেশে এক আত্মঘাতী মানববোমার বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় ৬০ জনের। ঘটনায় আহতের সংখ্যা দু'শোরও বেশি। ওইদিন পাকিস্তানের কোয়েটায় শিয়াদের একটি ধর্মীয় মিছিলে ঘটানো হয় বিস্ফোরণটি। তদন্তে জানা গিয়েছে, আত্মঘাতী ব্যক্তিটির বয়স ২০ থেকে ২২ বছরের মধ্যে। সে উজবেকিস্তানের বাসিন্দা বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। তবে তার সঙ্গে আল-কায়দার যোগাযোগ নিয়ে নিঃসন্দিহান তদন্তকারীরা।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সিপিএম স্বাধীনতার শত্রু

কমিউনিস্ট মতাদর্শে 'আমরা সবাই রাজা'—এই কথাটি স্বপ্নেও ভাবিবার জো নাই। মূলগতভাবেই কমিউনিস্টরা মত প্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার বিরোধী। তাহারা বিশ্বাস করে যে তথ্য প্রকাশের বিষয়টি দল এবং সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার এবং শাসক দল ও সরকারের উদ্দেশ্য সাধনই সংবাদমাধ্যমের লক্ষ্য হওয়া উচিত। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিস্টরা যখন ক্ষমতায় ছিল, তখন পরিকল্পনা মাফিক রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ঘটনাগুলি চাপিয়া দেওয়া হইত। কোনও রকমের মতদ্বৈধতা সহ্য করা হইত না। বিরোধীদের উপর নির্মম অত্যাচার, দেশ হইতে বহিষ্কার, এমন কী হত্যা করিয়া নিকেশ করা হইত। এমনকী আজ চীনেও কোনওরকম মতপ্রকাশ বা সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নাই। তাই সিপিএমের গুণ্ডা ও অনুগত ক্যাডার বাহিনী সাংবাদিকদের উপর আক্রমণ ও একজন রিপোর্টারের হাত ভাঙ্গিয়া দেওয়ার সংবাদে বিস্ময়ের কিছু নাই। এই ঘটনায় বিস্মিত ও ব্যথিত হইবার একটি কারণ অবশ্য রহিয়াছে। মনের গভীরে সিপিএমের যাহাই থাকুক না কেন, প্রকাশ্যে তাহারা সর্বাত্মক স্বৈরাচারী শাসনের নিন্দাই করিয়াছে। গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে কাজকর্ম করিয়া এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচিত হইয়াই সিপিএম পশ্চিমবঙ্গে শাসন ক্ষমতা দখল করিয়াছে। যদিও সিপিএমের কট্টরবাদীদের গণতন্ত্রে আদৌ বিশ্বাস নাই। নিজেদের সুবিধার জন্য তাহারা কেবলমাত্র গণতন্ত্রের বুলি কপচাইয়া থাকে।

এই প্রথম যে সিপিএমের ক্যাডাররা সাংবাদিকদের ভীতিপ্রদর্শন ও মারধোর করিয়াছে এমন নহে। ইহার পূর্বেও করিয়াছে। সাম্প্রতিক অতীতে—নন্দীগ্রামে হিংসাত্মক আন্দোলনের সময়ও ইহা দেখা গিয়াছে। দলীয় নেতৃত্বের অনুমতি লইয়া বা না লইয়া সাংবাদিকদের উপর সিপিএমের সমর্থক ও অনুগামীরা যখন হামলা করিয়া থাকে, তখন ইহার ধরন-ধারণ চিহ্নিত করা কষ্টসাধ্য নহে। কেননা যখনই সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা সিপিএমের মজুত অস্ত্রভাণ্ডার এবং বিরোধীদের খতম করিবার জন্য ধারাবাহিক সন্ত্রাসের খবরাখবর ফাঁসের চেষ্টা করিয়া থাকে, তখনই রিপোর্টার, ফটোগ্রাফাররা আক্রান্ত হয়। যখনই সিপিএম দেশের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি এবং আইন-শৃঙ্খলা অমান্য করিয়া থাকে, তখনই বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে তাহারা সংবাদমাধ্যমের উপর চড়াও হয়।

গণতন্ত্রের প্রতি মূলগতভাবে সিপিএমের এই অনাস্থা তাহাদের কাজকর্মের মধ্যেই প্রকট হইয়া থাকে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মে অংশগ্রহণ ও আইনের শাসনের প্রতি আস্থার কথা বলিলেও আগ্নেয়াস্ত্রের মজুত ভাণ্ডার গড়িতে তাহাদের কোনও দ্বিধা নেই। তাহাদের নেতারা হিংসাত্মক প্ররোচনা দিতে কখনও কুণ্ঠাবোধ করে নাই। নিজেদের ক্যাডার বাহিনীকে দমদম দাওয়াই-এর উস্কানিমূলক পরামর্শ বৃন্দা কারাতের মতো সিপিএমের নেতা-নেত্রীরা দিয়া থাকেন। হিংসায় বিশ্বাসের ব্যাপারে সিপিএমের সঙ্গে মাওবাদীদের মূলত কোনও ফারাক নাই। তবে সিপিএমের সমস্যা হইল, মাওবাদীরা গণতন্ত্র সংবিধান ইত্যাদি কিছুই স্বীকার করে না, সিপিএম প্রকাশ্যে অন্তত তাহা স্বীকার করে। অর্থাৎ ভণ্ডামি করে। একদিকে সংবিধানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ও অন্যদিকে সন্ত্রাস সৃষ্টি করিয়া নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখিবার প্রয়াস—সিপিএমের এই দ্বিচারিতাই সংবাদমাধ্যম প্রকাশ্য করিতে চায়। স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ—মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য এই যুদ্ধে সিপিএমকে তাহার ফল ভোগ করিতেই হইবে।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

আমাদের প্রাচীন আদর্শ ও ঐতিহ্যকে উপহাস এবং অন্যান্য আধুনিকবাদের ছাঁচে আমাদের সমাজকে ঢেলে সাজানোর কথা বলাটা, আজকের দিনে রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আমাদের সহজাত চরিত্রের স্বাভাবিক পরিস্ফুটনের দিকে নজর না দিয়ে আমাদের জীবনধারাকে অপর একটি জীবন দিয়ে প্রতিস্থাপিত করার চেষ্টা হলে তা কেবল অধঃপতনেরই অভিমুখী হবে। আমাদের সমাজের উপর এর ভয়াবহ পরিণতির লক্ষণ আমরা দেখাতে পাচ্ছি। অসংগঠিত ও নিজের ক্ষমতার প্রতি অবিশ্বাসী হওয়ায় আমাদের সমাজ বিবিধতা ও ধর্মের আবরণে সুযোগ সন্ধানে রত সমস্ত লুণ্ঠনকারী শক্তির সহজ শিকারে পরিণত হয়েছে।

যে সমাজ আত্ম-বিদ্রূপে মগ্ন থাকে, যে সমাজ সর্বব্যাপী বিপর্যয় ও অসংযত জীবন যাপনের দরুণ দুর্বল হয়ে পড়ে, যে সমাজ প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রত্যেকের হাতে লজ্জিত ও অপদস্থ হয়, সে সমাজের পক্ষে অন্যকে, সমগ্র বিশ্বকে শিক্ষা দেওয়া কি করে সম্ভব? যার নিজের জীবনকে মহিমান্বিত করার আন্তরিক বাসনা বা ক্ষমতা নেই, সে কি করে অপরকে মহত্ত্বের পথ দেখাবে?

সুতরাং মানব-সমাজকে আমাদের অনুপম জ্ঞানের আলোক উদ্ভাসিত করতে হলে, বিশ্বের ঐক্য কল্যাণের জন্য জীবনযাপন ও প্রয়াস চালাতে হলে, বিশ্বের সামনে আত্মবিশ্বাসী, পুনরুজ্জীবিত ও অমিত শক্তিধারী একটি রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্তই অপরিহার্য। প্রথম পদক্ষেপে বর্তমান হিন্দু-সমাজের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত উপাদানগুলিকে পার্থিব জীবন ও আধ্যাত্মিকতা উভয় স্তরেই এক সুসংগঠিত ও অজেয় শক্তিতে পরিণত করা চাই। বিশেষভাবে এটাই হলো একটি সত্যিকারের বাস্তব সম্মত বিশ্বজনীন আদর্শ।

—শ্রীগুরুজী

রাজনীতি ও আজকের পশ্চিমবঙ্গ

কর্ণেল সব্যসাচী বাগচী (অবঃ)

একজন প্রশিক্ষিত সৈনিক এবং সাধারণ নাগরিক হিসাবে ও রাজনীতিতে রুচি রাখা এক ব্যক্তি হিসাবে ভাবনার ফসল এই লেখা। মানুষ আমি Nature (প্রাকৃতিক জন্মসূত্র) ও Nurture (সামাজিক ভাবে গড়ে ওঠা) ভিত্তিক। সামাজিক মানুষ আমি ও আমরা সবাই দেশ ভিত্তিক এই দেশজ সত্ত্বায়, বাঙ্গালী আমরা প্রত্যেকই ভারতবাসী। যেহেতু ভারতবাসী, সেইহেতু কি স্মৃতি (Memories), কি সত্ত্বা (Realities), কি ভবিষ্যতের (Dreams) —অখন্ড কালখন্ডে আমাদের জীবনমন্ত্র হোক গায়ত্রী মন্ত্র। এই মন্ত্রের রবীন্দ্রনাথ কৃত বঙ্গানুবাদ হলো— "যাতে বাহিরে ছড়ায়ে পড়িছে পৃথিবী আকাশ তারা, যাতে আমার অন্তরে আসে বুদ্ধি চেতনা ধারা, তারই পূজনীয় অসীম শক্তি, ধ্যান করি আমি লইয়া ভক্তি"। এই মন্ত্র রূপায়ণের বিরাম বিহীন কর্মযজ্ঞের মহাওঙ্কার ধ্বনির, সাধনা চশমা দিয়ে তাই দেখতে চেষ্টা করব এবং তথ্য দিয়ে সম্যকভাবে বুঝতে চেষ্টা করব পূর্ণত্বের প্রতীক ভারতকে। তার খন্ডাংশ পশ্চিমবঙ্গকে। পশ্চিমবঙ্গ গত ৩৩-৩৪ বৎসর ধরে অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির ভাবনায় লালিত পালিত 'পোটেনশিয়াল ডিভাইন'-এর পূর্ণ মানুষকে বিজাতীয় ভাবনা ভিত্তিক 'পলিটিক্যাল' বা 'ইকনমিক অ্যানিম্যাল' বানানোর চেষ্টা চলছে। মানুষ হলো দেহ-মন-বুদ্ধি-আত্মার এক একাত্মরূপ। তাকে তাই আমরা শুধুমাত্র এক 'পলিটিক্যাল' বা রাজনৈতিক সত্ত্ব বা প্রতিভূ বলে বা শুধু মাত্র এক 'ইকনমিক' বা অর্থনৈতিক জীব বলে ভাবতে চাই না। ভাবতে পারবোও না। কারণ মানুষকে তাঁর পূর্ণত্বের সংজ্ঞায় না ভেবে, যদি এই টুকরো দর্শনে ভেবে গোড়াতেই গলদ করে বসি, তো তার উপর দাঁড়িয়ে কোনও কিছু গড়াতো যাবেই না, বরং সব কিছুই রসাতলে যাবে। আলবেরুনির লেখায় এর পরিচয় আমরা পাই। প্রবন্ধকাররা বলছেন, সেই সময় ভারতীয় হিন্দুরা উঠে গেল না বা শেষ হয়েও গেল না। তবে গুটিয়ে গেল। দ্বিধাবিভক্ত সমাজের সংহতির রূপ হলো সহাবস্থান। মূল মন্ত্র হয়ে উঠল, নিস্পৃহ নিরপেক্ষতা। এর থেকে এল দ্বিজাতিতত্ত্ব। দ্বিতীয় সংহতির ফলশ্রুতি, ইংরেজ শাসকের চোখ দিয়ে ভারতকে দেখা। 'A nation in the making' (রাজ্য রাষ্ট্র নয়)। ইংরেজ আমলে ধর্ম, সংস্কৃতির রূপ নিয়ে হিন্দু মুসলমানকে মিলিয়ে দিচ্ছিল। জাতীয়তাবাদ নামের সংহতির জোয়ারে, স্বাদেশিকতার জোয়ারে। কিন্তু ইংরেজকে বেঁচে থাকতে হলে বিভেদ সৃষ্টি করার দরকার ছিল। পার্থক্য তো ছিলই, দরকার ছিল শুধু ইন্ধন যোগানোর। ডিভাইড এ্যান্ড রুল নীতি একদলকে (জিন্নাপন্থীদের) সুয়োরানী করল, কংগ্রেসকে (প্রধানত হিন্দুদের) দুয়োরানী করল। ফল হলো, ভাগ

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিকে বিকল্প ধাঁচে ঢেলে সাজানো দরকার। দরকার সম্পূর্ণ রি-ইঞ্জিনিয়ারিং। যার লক্ষ্য হবে, সুশাসন দলতন্ত্র নয়, এক দলদাসহীন প্রশাসন, উন্নয়ন ও দলমত নির্বিশেষে সমস্ত নাগরিকদের জন্য এক সার্বিক নিরাপত্তা। এক অর্থে খাদ্য-পানীয়-জল-বস্ত্র-পরিবেশ বাসস্থান-চিকিৎসা-শিক্ষা-বিনোদন এর প্রভূত উন্নতি। এটা অবশ্য আমাদের জানা দরকার, যে 'কমিউনিস্ট চিন্তাধারা' আর 'উন্নয়ন' দুটি জিনিস এক ধরনের সোনার পাথরবাটির মতো।

আরাধনার যজ্ঞশালা হলো ভারতবর্ষ। এটিকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'হিয়া'। আর বিদ্রোহী কবি নজরুল বলেছেন 'বৃন্ত'। অর্থাৎ, গায়ত্রী জীবন মন্ত্রে ও জন্মভূমি-কর্মভূমি-পুণ্যভূমি যে ভারতের 'হিয়া' বা 'বৃন্ত' তাতে অবিশ্বাস হলে, না ভারত থাকবে না ভারতের অংশগুলি থাকবে; তা বাংলা-বিহার-পাঞ্জাব-গুজরাট-অসম-কেরল ইত্যাদি অংশগুলির নাম যাই হোক না কেন। বিভিন্ন নাম এবং বিভিন্নতা তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না। একটা কথা মনে রাখা দরকার যে চিন্ময়ী ভারত না বাঁচলে, পৃথিবীর বাঁচা কষ্টকর। প্রখ্যাত পশ্চিমী ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবি বলেন, "It is already becoming clear that a chapter which had a Western beginning will have to have an Indian ending, if it is not to end in self destruction of the human race. At the supremely dangerous moment in history, the only way of salvation for the mankind is the Indian way." অর্থাৎ পশ্চিমও স্বীকার করছে, ভারতের পথে চলেই পৃথিবী ও তার মানবসমাজ বাঁচবে। অন্যথা না। ভারতীয় চিন্তায় মানুষ 'Consumption Machine' নয়। পশ্চিমীদের সঙ্গে তাঁর তফাৎ এখানে। তাই বোধহয়, টয়েনবীর ওই চিন্তা (more and more energy and material goods consump-tion oriented life style).

আজকের পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে এই মহাভারতের মহাপরিবারের ছোট এক খন্ডাংশ। আমার আজকের এই প্রতিবেদনের পরিসর তারও এক খন্ডাংশ নিয়ে, অর্থাৎ সেখানে চলা রাজনীতি নিয়ে। রাজনীতির মনে রাখতে হবে যে রাজনীতি যদি মানুষকে তার সমাজ ও বিশ্বের সঙ্গে সংহতির পথে এগিয়ে না নিয়ে গিয়ে, বাধা সৃষ্টি করে তো সেই রাজনীতি সততই বর্জ্য। কারণ তা কল্যাণকারী হতে পারে না। তাহলে এটা পরিষ্কার যে লক্ষ্য হিসাবে রাজনীতিকে সংহতির চেষ্টা চালাতে হবে এবং সেই সংহতি জনকল্যাণকারী হতে হবে। স্মৃতির ভারতে, স্বাভাবিক ভাবে বাংলাতেও, দুটি সহিষ্ণুতা-সংহতির প্রচেষ্টা আমরা হতে দেখেছি। সেই সব প্রচেষ্টা অশুভ, অকল্যাণকারী শক্তির করাল গ্রাস থেকে দেশ ও দেশের মানুষকে বাঁচাতে সমর্থ হয়েছে। চিন্তাবিদ শ্রী অশীন দাশগুপ্ত ও অন্যান্য অনেকের মতে সেগুলি ছিল ঃ (ক) পৌরাণিক যুগের ব্রাহ্মণরা ৩৩ কোটি দেবতা বানিয়ে (এক এক দেবতা নিয়ে এক এক পুরাণ রচনা হয়েছিল) সারা ভারতকে এক করেছিলেন। এটিই প্রথম সংহতি, উদ্দেশ্য ছিল এই দেবতাদের মানুন। না পছন্দ হলে তাদের ওপরের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরকে মানুন। তাও না হলে ব্রহ্ম মানুন। এর পেছনে দর্শন হলো, যথা পিন্ডে তথা ব্রহ্মান্ডে (Whatever is there in micro-cosm is in macro-cosm too)। আজকের ভাবনায় ভাবলে এটা এক বিশাল বড় গণতান্ত্রিক ভাবনা— কত বিরাট তার স্বাধীনতার পরিধি। পছন্দ অপছন্দের তালিকা যে কত বিস্তৃত, তাকি ভাবা যায়। অর্থাৎ 'ডেমোক্রেসিতে ফ্রিডম' ও 'ওয়াইড চয়েসের' ব্যাপারে এর থেকে বড় কিছু হতে পারে কি? (খ) ১১০০ শতকের তুর্কি আক্রমণের (Plunder) পর দ্বিতীয় সংহতি। করা স্বাধীনতা। জাতি ভাগকে ভিত্তি করে, মাটি ভাগ হলো এবং আজকেও সংরক্ষণের ভোট ব্যাঙ্ক ভিত্তিক রাজনীতি করে, ভারতের সব মানুষকে কিছুতেই 'we the people' হতে দেওয়া হচ্ছে না। ভারত ভাগ করে, গীতা হাতে হাঁসতে হাঁসতে ফাঁসিকাঠে ঝুলে পড়া, 'বন্দেমাতরম' বলতে থাকা লোকেদের ভাববাদী পাগল প্রতিপন্ন করে, তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার নামে দেশে নতুন ধরনের সাম্প্রদায়িতার জন্ম দেওয়া হচ্ছে। তবে এই সাম্প্রদায়িকতার কেন্দ্রবিন্দুগুলো (Epicentre) পাল্টালো। লন্ডন-দিল্লীর বদলে তাদের নতুন ঠিকানা হলো ইসলামাবাদ-সৌদি আরব-চীন। আর মুসলিম লীগের জায়গা নিল আই এস আই-হুজি-লস্কর-জয়েস-এ-মহম্মদ-আল কায়দা ও মাওবাদী ইত্যাদি জঙ্গি সন্ত্রাসবাদী জেহাদী গোষ্ঠিরা। (গ) তৃতীয় সংহতি বর্তমানে শুরু হতে যাচ্ছে এবং তা হতে যাচ্ছে আবার সেই জাতীয়তাবাদের পথেই। ধনতন্ত্র বা মার্কসবাদ কোনটাই তাদের আচরিত পথে মানুষকে সুখ ও শান্তি এনে দিতে অক্ষম। তবে সেই নতুন ধরনের জাতীয়তাবাদী ভাবধারাকে বিশ্বের বর্তমানে ঘটে যাওয়া পাঁচটি 'মেটা ট্রেন্ড' (Meta Trend) এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে হবে। কি সেই সব যুগান্তকারী নতুন দিশা? এ৪কবার দেখে নেওয়া যাক। (১) সাংস্কৃতিক আধুনিকতা বা 'কালচারাল মর্ডানাইজেশন'। এর ফলে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের প্রভূত রকমফের আমরা দেখতে পাচ্ছি। শিক্ষার ধরনের প্রভূত বৈচিত্র্য, কর্মশীল মহিলাদের বিশালভাবে বাইরের

(এরপর ১৪ পাতায়)

তোষণ নীতির সুযোগ নিচ্ছে সন্ত্রাসবাদীরা

(১ পাতার পর)

বিষয়টি জানিয়ে এই সরকারি চিঠিতে মুর্শিদাবাদ জেলার নাম পরিবর্তন করে 'মুসলিমাবাদ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিতর্কিত চিঠির প্রতিলিপি স্বস্তিকায় ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু একমাত্র রাজ্য বিজেপি ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য সব রাজনৈতিক দলই বিষয়টি নিয়ে একটি কথাও বলেনি। অর্থাৎ, সিপিএম-কংগ্রেস-তৃণমূল সব দলেরই মনোভাব মুর্শিদাবাদকে মুসলিমাবাদ বললে তাদের আপত্তি নেই। এমনকী যুক্তিও দেখানো হয় যে এই জেলায় মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬৪ শতাংশ মুসলমান। তাই মুসলিমাবাদ বললে আপত্তি করার কিছুই নেই। চমৎকার যুক্তি। কারণ, এই যুক্তিতেই প্রতিবেশী ইসলামি রাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে মুর্শিদাবাদকে যুক্ত করতে অসুবিধা হবে না। জমি তৈরি করাই আছে।

মুর্শিদাবাদ জেলায় সাম্প্রদায়িক অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে হিন্দুদের উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্র বেশ কয়েক বছর ধরেই চলছে। তাতে ইন্ধন যোগাচ্ছে সিপিএম-কংগ্রেস-তৃণমূলের তোষণনীতি। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জঙ্গিপুর এলাকায় আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস খুলে দিচ্ছেন। সিপিএমের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য রাজ্যে সরকারি চাকরিতে মুসলিমদের ১০ শতাংশ সংরক্ষণ দিচ্ছেন। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুসলিম তোষণে নিবেদিত প্রাণ। মুসলমানদের খুশী করতে রেলমন্ত্রীর সরকারি চিঠিপত্রে তাঁর 'বন্দ্যোপাধ্যায়' পদবি ত্যাগ করেছেন। রেলমন্ত্রীর নাম এখন শুধুই মমতা। দিল্লি-কলকাতায় ইফতার পার্টিতে উপস্থিত থাকাটা তিনি রুটিন করে ফেলেছেন। নিট্ ফল, রাজ্যের মুসলিম সমাজ বার্তা পেয়েছে যে তারাই পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে শেষ কথা বলবে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার দায় হিন্দুদেরই নিতে হবে। কারণ, রাজ্যের ক্ষমতাসীন ও প্রধান বিরোধী জোট সকলেই মুসলিম ভোট ভিক্ষায় নেমেছে। মুর্শিদাবাদে হিন্দুরা সংখ্যালঘু।

গত ১৪ এপ্রিল চড়ক পূজাকে কেন্দ্র করে মুর্শিদাবাদে হিন্দুদের উপর সাম্প্রদায়িক আক্রমণ শুরু হয়। সেই অশান্তির আগুন নেভেনি। ধিকিধিকি জ্বলছেই। সম্প্রতি ভগবানগোলা এলাকায় হিন্দুদের উপর ভয়াবহ আক্রমণ হয়েছে। বাড়ি, ধানের গোলা ইত্যাদি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রাণ ও সম্পত্তির বিপুল ক্ষতি করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক পরভেজ সিদ্দিকির বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ এনেছেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি রাহুল সিন্‌হা। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে লেখা চিঠিতে তিনি স্পষ্ট অভিযোগ করেছেন, পরভেজ সিদ্দিকি স্থানীয় "ঘোষ সম্প্রদায়কে" হুমকি দিয়েছেন যে মুসলমানদের গায়ে হাত তুললে চরম শাস্তি দেওয়া হবে। জেলাশাসকের সুরে সুর মিলিয়ে একই কথা বলেছেন ফরাক্কার বিডিও। তাঁদের ক্রোধের কারণ, মুর্শিদাবাদে হিন্দুদের উপর হামলা হলে রুখে দাঁড়ান ঘোষেরা। তাঁদের লাঠির জোরেই মুর্শিদাবাদকে মুসলিমাবাদ করা সম্ভব হচ্ছেনা। ঘোষ সম্প্রদায় তাই পরভেজ সিদ্দিকিদের পরিচালিত প্রশাসনের চক্ষুশূল। সিপিএম-কংগ্রেস-তৃণমূলের ভোট রাজনীতির কাঁটা। পশ্চিমবঙ্গে এই তিন রাজনৈতিক দলই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করে। অথচ প্রচার চলে এরা নাকি ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল। সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এই.....।

সঙ্কটের মুখে সংসদ ভবনের বিরল চিত্র

(১ পাতার পর)

শুধু মেরামতই নয়, ভবিষ্যতে ছবিগুলো রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে তিনি কথা বলেন লোকসভার স্পীকার মীরা কুমারের সঙ্গেও। তিনি বলেন, "ছবিগুলোকে ধূলো ময়লার হাত থেকে বাঁচাতে কাঁচের আবরণের মধ্যে ঢেকে রাখা উচিৎ। ছবিগুলো পরিষ্কার করার সময় সতর্ক হতে হবে সাফাই কর্মীদেরও।

এরজন্য প্রত্যেকটি সাফাই কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রাদান করা অত্যন্ত জরুরি।" এছাড়া ভবনের করিডরে আলোর অভাবের কথাও উল্লেখ করেন ভাটনগর।

১৯৫১ সালের বহু চিত্রশিল্পীর আঁকা ছবিগুলোর মাধ্যমে ভবনের শোভা বাড়ানোর কথা প্রথম ভেবেছিলেন প্রথম লোকসভার স্পীকার জি ভি মবলঙ্কর। ছবিগুলোর মধ্যে চেন্নাইয়ের এইচ্ ভি রামগোপালের আঁকা যোগীরূপী মহেশ্বর এবং হিমাচলপ্রদেশের শোভনা সিংয়ের আঁকা গুরু নানক ও গুরু গোবিন্দ সিং-এর ছবি উল্লেখযোগ্য।

একাধিক চীনা প্রকল্প

(১ পাতার পর)

সম্পূর্ণ মোবাইল পরিষেবা দিচ্ছে পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে।

ডায়ামের-ভাসা জলাধার ঃ ৪৫০০ মেগাওয়াট ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ওই জলাধারটি গড়ে তুলতে চীন দিচ্ছে ১১৩ কোটি ডলার। চীনের তিনটি কোম্পানী এই প্রকল্পে যুক্ত।

মাঙ্গলা জলাধার প্রকল্প ঃ চীনা ইন্টারন্যাশানাল ওয়াটার অ্যান্ড ইলেকট্রিক কর্পোরেশান এবং কয়েকটি পাক-কোম্পানীর মিলিত তত্ত্বাবধানে এই প্রকল্পের কাজ একেবারে শেষ পর্যায়ে।

নিলম-ঝিলম হাইড্রোপাওয়ার প্রজেক্টঃ ভারতীয় এলাকায় যখন কিষেণগঙ্গা প্রকল্পের কাজ চলছিল, তখন পাকিস্তানের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল মুজফঃরাবাদে ৯৬৯ মেগাওয়াট ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন জলাধার নির্মাণের কাজ তারা আট বছরের মধ্যে শেষ করবে। কিন্তু তা সময়মতো শেষ না করে সিন্ধু জল চুক্তি অনুযায়ী কিষেণগঙ্গা প্রকল্পে বাধা দান করে পাকিস্তান। এখন ভারতের সঙ্গে করা চুক্তি লঙঘন করে চীনের সহায়তায় নিলম-ঝিলম হাইড্রোপাওয়ার প্রকল্পে অংশ নিয়েছে পাকিস্তান। পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের নিকটবর্তী গিলগিট-বালতিস্তানে কয়েকটি বড় মাপের হাইড্রোপাওয়ার প্রকল্প, ভুনজি প্রকল্প, কোহালা প্রকল্প (১১০০মেগাওয়াট), নলতার প্রকল্প এবং পানধের, হারপো ও উরলবো-তে কয়েকটি ছোট-আকৃতির হাইড্রোপাওয়ার প্রকল্প গড়ে উঠছে চীনের মদতে। ইতিমধ্যেই সেখানকার কাশ্মীরের ভূমিকম্পের কারণে সাহায্যার্থে ৩০০০ কোটি ডলার দিয়েছে চীন। একইভাবে ৯০ কোটি টাকা সাম্প্রতিক বন্যা-দুর্গতদের জন্য পাক-অধিগৃহীত কাশ্মীরকে সাহায্য করেছে চীন। কূটনৈতিক মহলের অভ্রান্ত অনুমান, এতে সেবার গন্ধ ছিঁটেফোঁটা নেই। যা আছে তা হলো তৃতীয় বিশ্বের দুই প্রবল শক্তিধরের (অর্থাৎ ভারত ও চীন) মধ্যে এক শক্তিধরের (পড়ুন চীন) টেক্কা দেওয়ার খেলা। আর সেই ক্রীড়ায় সহজবোধ্য স্ট্রাটেজি— শত্রুর শত্রু, আমার মিত্র।

ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জয়ী এবিভিপি

(১ পাতার পর)

প্রতিপক্ষ কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন এন এস ইউ আই-এর হরিশ চৌধুরীকে ১,৯৪৩ ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে দেন। এই সভাপতি নির্বাচনেই জিতেন্দ্র-র আর এক প্রতিপক্ষ সিপিআই-এর নেতা ডি রাজার মেয়ে অপরাজিতা রাজা ভোট-সংখ্যার বিচারে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। সভাপতি ছাড়াও সহ-সভাপতি এবং সম্পাদক পদে যথাক্রমে এ বি ভি পি-র প্রিয়া দাবাস এবং নীতু দাবাস জয়লাভ করেন। এইভাবে বিরোধীদের সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বি ভি পি-র জয় এল প্রায় ৮ বছর বাদে। স্বভাবতই উল্লসিত বিদ্যার্থী পরিষদের দিল্লীর রাজ্য সম্পাদক আশুতোষ শ্রীবাস্তব। তাঁর ব্যাখ্যা "রাহুল গান্ধী সবসময়ে বলেন যুবকরা এন এস ইউ আই এবং কংগ্রেসের দিকে রয়েছে। কিন্তু দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ফলাফল দেখিয়ে দিল যুব-সম্প্রদায় আমাদেরসঙ্গেই রয়েছেন।" অন্যদিকে এই ফলাফলকে মেনে নিয়ে মুষড়ে পড়া কংগ্রেস শিবিরের বক্তব্য, "এইরকম হতাশাজনক ফলাফল কেন হলো তা বিশ্লেষণ করে দেখা হবে।" তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে এবিভিপি-র এই সাফল্য দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিস্টার সিস্টেম, কমনওয়েলথ গেমসের নামে হোস্টেল-সুবিধা দেওয়া নিয়ে দুর্নীতি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ 'ইস্যু' নিয়ে আন্দোলন করাতেই এসেছে।

এবারের ভোটে চীফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক জে এম খুরানা জানান, '৯৬,৬৭৮ জন ভোটারের মধ্যে ৩২, ৪৬১ জন ভোটার তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেছেন।' সভাপতি পদে জয়ী জিতেন্দ্রর প্রাপ্ত ভোট ৯,২৫৯, পরাজিত এন এস ইউ আই-এর হরিশ চৌধুরী ৭৩১৬ ভোট পান। অপরাজিতা রাজা পান ২,৯৯৯টি ভোট। সহ-সভাপতি নির্বাচনে প্রিয়া দাবাস ৮,৬৭৯টি ভোট পেয়ে এন এস ইউ আই-এর বর্ধন চৌধুরীকে ১,৫১৮ ভোটে পরাজিত করেন। সম্পাদক পদে নীতু দাবাস ৪,৪৯৬ ভোটের বিপুল মার্জিনে হারিয়ে দেন নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে। এন এস ইউ আই-এর পক্ষে যুগ্ম-সম্পাদক পদে একমাত্র জয়ী অক্ষয় কুমার। তিনি যুগ্ম সম্পাদক পদে বিদ্যার্থী পরিষদের পণ্ডিত সৌরভ উনিয়ালকে মাত্র ৬২৬ ভোটে হারিয়ে দেন।

শুধু দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়েই নয়, পাঞ্জাব ও জয়পুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সংসদ নির্বাচনেও বিদ্যার্থী পরিষদেরই জয়-জয়কার। বলা বাহুল্য, আম-আদমীর সিপাহীকে যুব-আদমীরা পাত্তা দিচ্ছে না মোটেও।

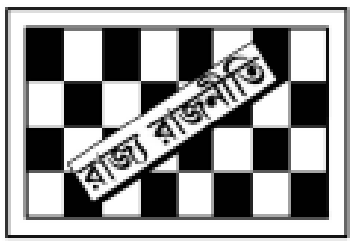

রাজ্য রাজনীতিতে অশনি সংকেত

নিশাকর সোম

রাজ্য রাজনীতিতে আলোড়ন সৃষ্টি করা ঘটনা হলো—জঙ্গলমহলে যৌথবাহিনী এবং সিপিএম-এর 'স্বেচ্ছাসেবক' ও 'ঘরছাড়া' কর্মীদের যৌথ 'ব্যবস্থায়' (আক্রমণে?) সিপিএম-এর পুনর্বাসন। আবার খুললো সেখানকার পার্টি অফিস— নেতৃত্বে সেই অনুজ পাণ্ডে— যাঁর বাড়ি জনসাধারণের কমিটি ভেঙে দিয়েছিলেন। অনুজের প্রাসাদোপম বাড়ি থাকার কৈফিয়ত দিয়ে সিপিএম বলেছিল, তিনি ব্যবসা করে এই বাড়ি করেছেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই ঘটনা সিপিএম-এর কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামেও উল্লেখিত হয়েছে। সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পরে রাজ্য-কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, পার্টি সদস্যদের সম্পত্তি সম্পর্কে পার্টিকে জানাতে হবে। মন্ত্রী মানব মুখার্জি ভর্ৎসিত হয়েছেন রাজারহাটে জমি কেনার ঘটনা পার্টিকে না-জানানোর জন্য। সিপিএম-এর কলকাতা জেলা-কমিটির সম্পাদক, মানব মুখার্জি-কে 'সেনসর' করার প্রস্তাব দিয়েছেন। এ-সব করতে যাওয়া মানে— কম্বলের লোম বাছতে গিয়ে গোটা কম্বলটাই ফেলে দেওয়া।

যা হোক, কয়েকমাস ধরে যৌথবাহিনীর সঙ্গে একত্রে কাজ করে সিপিএম জঙ্গলমহলে নিজেদের আগের অবস্থানে ফিরিয়ে আনতে পেরেছে। এদিকে রেলমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী বলেছেন, যৌথবাহিনী চলে গেলে সিপিএম টিকতে পারবে না। তাই যৌথবাহিনী প্রত্যাহার এবং কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ দাবি করা হচ্ছে। তৃণমূল সাংসদ শুভেন্দু আধিকারীও বলেছেন, যৌথবাহিনী না থাকলে সিপিএম সভা করার স্থান গোটা মেদিনীপুরে পাবে না। এইভাবেই যুদ্ধের দামামা বাজছে। জঙ্গলমহলের সাধারণ মানুষ ফুটবল অফ পলিটিক্স-এ পরিণত হয়েছেন।

আর এস পি নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামী আবার বলেছেন, "জঙ্গলমহলের শিবিরগুলিতে 'আত্মরক্ষার্থে' অস্ত্র মজুত আছে!" তবে আর এস পি এখন বামফ্রন্টের মধ্যে থেকেই সিপিএম-এর বিরুদ্ধে বলে যাবে। আর এস পি-এর দাবি নকশালদের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে বামফ্রন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। তাঁরা চান সিপিআই এম এল (লিবারেশন)-কে এখনই বামফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত করা হোক, ক্ষমতার গুড়ে আর এস পি-এর পা-আটকে গেছে। আর এস পি-এর মধ্যে ক্ষিতি গোস্বামীর সমালোচনা করেন বহু নেতা। যেমন, মিহিরবাবু বলেছেন, "ক্ষিতিবাবু মুখে সমালোচনা করে পার্টিকর্মীদের কাছে 'বিপ্লবী' সাজার চেষ্টা করেন। অথচ তলে তলে সিপিএম-এর সঙ্গে একমত হন বামফ্রন্টে।"

আর এস পি নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামী আবার বলেছেন, "জঙ্গল-মহলের শিবিরগুলিতে 'আত্মরক্ষার্থে' অস্ত্র মজুত আছে!" তবে আর এস পি এখন বামফ্রন্টের মধ্যে থেকেই সিপিএম-এর বিরুদ্ধে বলে যাবে। আর এস পি-এর দাবি নকশালদের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে বামফ্রন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। তাঁরা চান সিপিআই এম এল (লিবারেশন)-কে এখনই বামফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত করা হোক, ক্ষমতার গুড়ে আর এস পি-এর পা-আটকে গেছে।

কোচবিহারের দিনহাটার পুলিশের গুলি চালানোর রিপোর্ট সরকারের নিকট পেশ করা হয়েছে। ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য-কমিটির সম্পাদক অশোক ঘোষ এই রিপোর্ট প্রকাশ না করার জন্য সরকার-কে বলেছিলেন। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে ফরওয়ার্ড ব্লকে বিক্ষোভ ওঠে। কিন্তু ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য-সম্পাদকমণ্ডলীর সভায় অশোকবাবু বলেছেন যে এই রিপোর্টে বলা হয়েছে উদয়ন গুহ সহ ফরওয়ার্ড ব্লক কর্মীদের উসকানিতেই পুলিশ গুলি চালাতে বাধ্য হয়। কাজেই সিদ্ধান্ত হয় কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে কোনও ফরওয়ার্ড ব্লক কর্মী-নেতাদের মুখ বন্ধ রাখতে হবে। আলোচনায় উদয়ন গুহ (প্রয়াত কমল গুহের পুত্র) সম্পর্কেও সমালোচনা উঠেছে। অশোক ঘোষ সিপিএমকে সমর্থন করে থাকতে চান।

বামফ্রন্টের মধ্যে এখন সব শরিকই সিপিএম-এর সুরে সুর মেলাচ্ছে। তবে নির্বাচনের সময়ে তলায় তলায় অন্য কাণ্ড ঘটবেই। সব শরিকই সিপিএম-কে কাট-টু সাইজ করতে চাইছে। এতো গেল বামফ্রন্টের অবস্থা। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সিপিএম-এর সদ্য সমাপ্ত দু'দিনের রাজ্য-কমিটির সভা দেড় দিনে শেষ করা হলো। সভায় মানব মুখার্জি, গৌতমদেব, মানিক সান্যাল-এর সমালোচনা হয়েছে।

মানিক স্যানাল জলপাইগুড়ি জেলা-সম্পাদকের পদ ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। রাজ্য কমিটির সভায় আগামী বিধানসভা নির্বাচনে পার্টির ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা হয়। সিদ্ধান্ত হয় যেন তেন প্রকারেণ পার্টির হৃত জমি উদ্ধার করতেই হবে। মোটামুটি মূল্যায়ন করে রাজ্য-কমিটি দেখেছে যে জোট সংখ্যাগরিষ্ঠ হলে বামফ্রন্টের ফলাফল লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল থেকে ভাল হবে। অন্ততঃপক্ষে একশটি আসন পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এজন্য যে সব পার্টিকর্মী বিগত পৌর নির্বাচনে মোটেই কাজ করেননি, তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সিপিএম এখনই গোটা রাজ্যে ক্ষমতা নিয়ে অর্থাৎ ম্যান, ম্যাসল, মানি-র দ্বারা জমি উদ্ধারের কাজে নেবে পড়বে। এদিকে তৃণমূলও দখলী জমি বিনাযুদ্ধে সূচাগ্র মেদিনী ছাড়তে চাইবে না, এর ফলে রাজ্যে গুরুতর হাঙ্গামার অশনি সঙ্কেত দেখা যাবে।

এরাজ্যে কংগ্রেস-এর মধ্যে মারামারি শুরু হয়ে গেছে। শচীন পাইলট-এর সামনেই মারামারি হয়েছে। রাজ্যসভায় কংগ্রেস নেতা কেশবরাও— যিনি পশ্চিমবঙ্গের জন্য ভারপ্রাপ্ত, তিনি কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ মন্ত্রী কপিল সিবাল-কে তীব্র সমালোচনা করেছেন। এহেন কেশব রাও কি করে রাজ্য-কংগ্রেসের কাজিয়া বন্ধ করবেন? ক্ষমতা বড়ই বিষম বস্তু। এজন্যই কামড়া-কামড়ি। অনেক সময়ে এতে হিংস্রতাও দেখা যায়। রাজ্যে দুই যুযুধান গোষ্ঠীর অভ্যন্তরের এই চিত্র। তাদের লক্ষ্য একটাই— বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে ক্ষমতা দখল। এঁদের মধ্যে জনসাধারণ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই। জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে, বিদ্যুতের দাম বাড়ছে, বাসভাড়া বাড়বে, সরকারি হাসপাতালে পরিষেবা নেই— নৈরাজ্যজনক অবস্থা। আমলাদের মধ্যে উভয়সঙ্কট, শ্যাম রাখি না কুল রাখি অবস্থা। এ-সরকার পঙ্গু হয়ে গেছে। এই ফ্রন্ট সরকারে এলে পঙ্গুত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে ঔদ্ধত্য বৃদ্ধি পাবে। জনগণ সাবধান হবেনই। নির্বাচনে হাঙ্গামার কালো মেঘ দেখা যাবেই।

সাঁইভক্তদের বিমানবন্দর

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ পাথর প্রতিমা নয়। কলিযুগে ভক্তরাই ভগবান। হাস্যকর মনে হলেও এটাই সত্যি। কারণ একথা প্রমাণ করতে চলেছে সিরডি সাঁইবাবা মন্দিরের লক্ষাধিক ভক্তবৃন্দ।

সম্প্রতি মুম্বইতে দ্বিতীয় বিমানবন্দর গড়ার পরিকল্পনা করে মহারাষ্ট্র সরকার, হতে চলেছে বিমানবন্দরটি। সেই অর্থে মহারাষ্ট্রের কপালে জুটল আরও একটি বিমানবন্দরের সৌভাগ্য। তবে মুম্বই-তে নয়, সিরডি-তে। এই যা। প্রতিদিন প্রায় ৩০ হাজার দর্শনার্থীর ঢল নামে মন্দির প্রাঙ্গণে। তবে বৃহস্পতিবার ও রবিবার সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৭০ হাজার। এখানেই শেষ নয়, দীপাবলি বা নববর্ষের মতো পালা-পার্বনের দিনে প্রায় দেড় লক্ষ দর্শনার্থীর সমাগম ঘটে মন্দিরটিতে। সামিল থাকেন অনেক

সিরডি সাঁইবাবা মন্দির।

যাত্রীদের সুবিধার কথা ভেবেই নেওয়া হয়েছিল এই সিদ্ধান্ত। কিন্তু সমস্ত পরিকল্পনাতেই জল ঢেলে দেন পরিবেশ মন্ত্রক। রাতারাতি ভেস্তে যায় মুম্বইবাসীদের স্বপ্ন। কিন্তু কথায় বলে 'রাখে হরি মারে কে'। মুম্বইবাসীর অধরা স্বপ্নকে ছুঁয়ে ফেলছেন মহারাষ্ট্রের অপর প্রান্ত সিরডির মানুষজন। সৌজন্যে সেখানকার সাঁইবাবা মন্দিরের ভক্তবৃন্দ। তাঁদেরই দানের টাকায় নির্মিত নামীদামী ব্যক্তিত্বরাও।" একথা জানান মন্দিরের একজন কর্মচারী। মন্দিরটির বর্তমানে পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে সিরডি সাঁইবাবা সনাতন ট্রাস্ট (এস এস এস টি)। এস এস এস টি সূত্রানুযায়ী, 'বিমানবন্দরটি তৈরি করতে প্রায় ২৬০ কোটি টাকার প্রয়োজন। এর মধ্যে প্রায় ১০০ কোটি টাকারই বন্দোবস্ত হবে ভক্তদের দানের মারফৎ। এই প্রকল্পে প্রায় ৬০ কোটি টাকার অনুদান দেবে মহারাষ্ট্র এয়ারপোর্ট ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড, যারা বিমানবন্দরটি ভবিষ্যতে নিয়ন্ত্রণ করবে। বিমানবন্দরটির মালিকানা থাকবে শ্রী সাঁইবাবা এয়ারপোর্ট চ্যারিটেবিল ট্রাস্টের উপর। এছাড়া যেসব সংস্থা, জনস্বার্থে বিভিন্ন পরিষেবায় বিমানবন্দরটিকে ব্যবহার করতে আগ্রহী তাদেরকেও অগ্রিম টাকা জমা দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে যাতে তারা নির্দিষ্ট সময় ধরে বিমান বন্দরটি ব্যবহার করতে পারে। তবে এই সম্পূর্ণ প্রকল্পটিই থাকবে ৮০ সিসি ধারায় ট্যাক্সের আওতার বাইরে। একথাও সাফ জানিয়েছে এস এস এস টি। বিশ্বস্ত মহলের সূত্রানুযায়ী, বিমানবন্দরটিতে চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত থাকবেন খোদ্ মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী।

সম্প্রতি একটি দৈনিকে এম এ ডি সি'র ভাইস চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আর সি সিনহা এই বিষয়ে বলেন, "রাজ্য সরকারও এই প্রকল্পটিকে বাস্তবায়িত করতে যথেষ্ট উদ্যোগী। রাজ্য সরকার নিজের সংগৃহীত জমিকে বন্ধক রেখে প্রায় ৪০ কোটি টাকার বন্দোবস্ত করবে। প্রকল্পটির স্বার্থে কার্যকর করা হবে বিনা সুদের অনেক বন্ডকেও"।

"খুব শীঘ্রই মহারাষ্ট্রের বুকে ঠাঁই পাবে দ্বিতীয় বিমানবন্দরটি। তারিখটা হবে ২৬ অক্টোবর, ২০১১। হায়দরাবাদ, ব্যাঙ্গালোর, দিল্লী সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বাড়বে বিমানের আনাগোনা। বাড়বে যাত্রীদের ব্যস্ততাও। গন্তব্যস্থল তখন একটাই— সিরডি বিমানবন্দর'। জানালেন এম এ ডি সি'র একজন কর্তৃপক্ষ।

বাংলাদেশীদের তাড়ানোর দাবিতে আন্দোলনের ডাক বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি।। সুষমা স্বরাজের বক্তব্যের ক'দিন বাদেই অসম রাজ্য বিজেপি রাজ্য থেকে বাংলাদেশী দখলদার উচ্ছেদের ডাক দিল। জনসভা, মিছিল, মিটিং-এর মাধ্যমে আন্দোলনে নেমে পড়ল। গত ২৭ আগস্ট বরপেটা জেলার পাঠশালায় রাজ্য সভাপতি রণজিৎ দত্ত এক জনসভায়

বক্তব্য রাখছেন রনজিৎ দত্ত।

বাংলাদেশীদের (পড়ুন বাংলাদেশী মুসলমান) দখলে থাকা বৈষ্ণবীয় সত্রের হাজার হাজার বিঘা জমি খালি করার জন্য রাজ্য সরকারকে আহ্বান জানান। এটা মূলতঃ বাংলাদেশীদের রাজ্য থেকে বহিষ্কারের দাবী। ২০১১-তে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি দল জাতীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতেই এই চলতি আন্দোলনের ডাক দিয়েছে বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা।

জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বিজেপি'র সর্বভারতীয় সম্পাদক তাপির গাও বলেন, অসম এবং মূল অসমবাসীদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই সকল বাংলাদেশীদের বহিষ্কার একান্ত জরুরী। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ-এর বাংলাদেশী বিতাড়নে কোনও সদিচ্ছাই নেই। অরুণাচল প্রদেশ এবং মেঘালয় যখন চল্লিশ হাজার বাংলাদেশীকে তাদের রাজ্য থেকে বহিষ্কার করেছিল তখন কংগ্রেস পরিচালিত অসম সরকার তাদেরকে অসমেই জায়গা করে দিয়েছিল। আরও আশ্চর্যজনক হলো গুয়াহাটি হাইকোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও যে হাজার হাজার বিঘা বৈষ্ণবীয় সত্রের জমি বাংলাদেশী মুসলমানরা জবরদখল করেছে তাও মুক্ত করতে অসম রাজ্য সরকার কোনও চেষ্টাই করেনি। শ্রী তাপির আরও বলেন, ১৯৯৭ সালের ২৭ মার্চ হাইকোর্ট সত্রের জমি দখলমুক্ত করতে এবং রাজ্যে ধর্মান্তরকরণ বন্ধ করতে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল।"

সম্প্রতি সরাইপাঙ-এর ঘটনাবলীকে শ্রীগাও রাজ্য সরকারের অবদান বলে উল্লেখ করেন। তিনি উপস্থিত জনসাধারণকে ২০১১-তে রাজনৈতিক পরিবর্তন করার আবেদন জানান।

রাজ্য বিজেপি'র সভাপতি রণজিৎ দত্ত বলেন, ২০১১-তে তাঁর দল ক্ষমতায় এলে প্রথম কাজ হবে বৈষ্ণবীয় সত্রের জমি পুনরুদ্ধার করা এবং বাংলাদেশীদেরকে অসম থেকে বহিষ্কার করা। এছাড়াও তাঁর দল 'বরপেটা সত্র'-কে হেরিটেজ (সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য) ঘোষণার স্বপক্ষে বলে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দেন।

প্রসঙ্গত, অসম এবং উত্তরপূর্বাঞ্চল জুড়ে ব্যাপক সংখ্যায় বৈষ্ণবীয় সত্র রয়েছে। রয়েছে সত্রের অধীনস্থ 'নামঘর' (উপাসনাস্থল) এবং প্রভূত জমি। অসমে আবির্ভূত সন্ত মহাত্মা শ্রীমন্ত শংকরদেব ধর্ম-সংস্কৃতি বজায় রাখতে ওই সকল সত্র স্থাপন করেন। কালক্রমে সত্রের সংখ্যাও যেমন বেড়েছে তেমনই বিস্তৃত হয়েছে সত্রের মাধ্যমে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সত্রের প্রমুখ সম্মানীয় মর্যাদার আসনে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত।

প্রাক্তন বিজেপি সভাপতি ও সাংসদ রাজেন গোহাঞি-র বক্তব্য— অসমের দিগ্বিজয়ী বীর লাচিৎ বরফুকন ১৭ বার মোগল আক্রমণকারীদের পরাজিত করে অসমকে, অসমের মানুষ ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করেছিলেন। বর্তমানে অসমে ঢুকে পড়া বাংলাদেশীরা অসমের সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির পক্ষে মারাত্মক বিপদের কারণ। সেজন্য শ্রী দত্তও ২০১১-এর বিধানসভা নির্বাচনে অসমের জনগণকে পট পরিবর্তনের আহ্বান জানান।

সত্রের জমির ব্যাপারে রাজ্য বিজেপি অসমের কংগ্রেসী সরকারকে এবার নির্বাচনের মুখে চেপে ধরেছে। তাদের বক্তব্য, শাসক দলই সত্রের জমি, মন্দির, দেবস্থান প্রভৃতি জবরদখল করতে বাংলাদেশীদেরকে উৎসাহিত করেছে নীরব ও নিশ্চুপ থেকে। শাসক দল ওই বাংলাদেশীদের অসমে স্থায়ী পুনর্বাসন দিয়ে দলীয় ভোটব্যাঙ্ককে স্ফীত করে বহাল তবিয়তে রাখতে চাইছে। এই অভিযোগ জানিয়েছেন রাজ্য বিজেপি-র মুখপাত্র ডঃ প্রদীপ ঠাকুরিয়া। গত ২৬ আগস্ট তালিকা দিয়ে সাংবাদিকদের তিনি জানিয়েছেন— ৩৯টি সত্রের ৬,৮৮০ বিঘা জমি জবরদখল করেছে সন্দেহভাজন লোকেরা, যাদের নাগরিকত্ব নিয়েই সন্দেহ রয়েছে। বিজেপি নেতার প্রদত্ত তালিকাটা এরকম—

বরপেটা-৪৬০ বিঘা, পাটবাউসি-৮১ বিঘা, রামরাই কুটীর-১১ বিঘা, সিমলবাড়ি-১৯৫ বিঘা, ভবানীপুর-১৯৫ বিঘা, ধূপঢোল-১৮২ বিঘা, কোবালকুচি-৪৮ বিঘা, বড়দুয়ার-১২০ বিঘা, বালি-৪৬৩ বিঘা, রামপুর-৪৩০ বিঘা, রামরাই টিং-৩২১ বিঘা, আদি এলেনগি-১,৯০০ বিঘা, বড় এলেনগি-১০৫ বিঘা, সাতপুর-৪৮ বিঘা, জিপাহ-৩৪ বিঘা, নিকামুর-১০ বিঘা, বাপুঝাড়-১১০ বিঘা, দামুদর-৪৮ বিঘা, বিষ্ণুপুর-১৬১ বিঘা, সামোরিয়া-৫০ বিঘা, মালানসা-৪২ বিঘা, বোহরি-১৯০ বিঘা, জানিয়া-১৬০ বিঘা।

জমির বিষয়ে জনগণকে জানাতে তিন বিজেপি নেতা-রাজ্য সভাপতি রণজিৎ দত্ত, কেন্দ্রীয় সম্পাদক তাপির গাও এবং প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি ও সাংসদ রাজেন গোহাঞি জেলায় জেলায় জনসভা করতে বেরিয়ে পড়েছেন। গত ২৭ আগস্ট বরপেটায় তার সূত্রপাত হয়ে গেছে।

ঢাকায় সাড়ম্বরে জন্মাষ্টমী উৎসব

সংবাদদাতা।। শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। আর বাংলাদেশ সরকার জন্মাষ্টমী তিথিকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করেছে। দেশের হিন্দু জনগণকে জন্মাষ্টমীর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান।

ঢাকার একটি পত্রিকার জন্মাষ্টমীর প্রতিবেদনের সামান্য অংশ এখানে তুলে দেওয়া হলো—

"সনাতন ধর্ম অনুসারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করতে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শান্তিহীন পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। হিন্দুদের অন্যতম ধর্মীয় গ্রন্থ

ঢাকায় জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শোভাযাত্রা।

শ্রীমদ্ভগবদগীতার উদগাতাও শ্রীকৃষ্ণ। তিনি দ্বাপর যুগের বিশৃঙ্খলা, মূল্যবোধের অবনতির সময়ে মানবপ্রেমের আমিত বাণী প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলনই সেই বাণীর মূল বিষয়। তাই তিনি ভক্ত ও বিশ্ববাসীর কাছে পরমাবতার। ধর্মানুসারে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। ভক্তদের বিশ্বাস শ্রীকৃষ্ণের বাণী হাজার হাজার বছর ধরে সমগ্র বিশ্বকে আলোড়িত করেছে।"

এবছর জন্মাষ্টমী উৎসব পালিত হয় যজ্ঞ, পূজা, গীতাযজ্ঞ, ভজন-কীর্তনের মাধ্যমে। ঢাকা মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি ঢাকেশ্বরী মন্দিরের মেলাপ্রাঙ্গণে দু'দিন ব্যাপী আলোচনাসভা মেলার আয়োজন করেছিল। জন্মাষ্টমীর মূল মিছিলটিও সেখান থেকে বের হয়। ১ সেপ্টেম্বর সকালে শোভাযাত্রা ও শ্রীশ্রী গীতাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন— ঢাকা মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সভাপতি বীরেশ চন্দ্র সাহা, সাধারণ সম্পাদক বাবুল দেবনাথ, বাংলাদেশ ছাত্র-যুব ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক পরিমল কুমার চট্টোপাধ্যায়, স্বেচ্ছাসেবক লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অ্যাডভোকেট মৌলানা মহম্মদ আবু কাওসার, সাধারণ সম্পাদক পঙ্কজ দেবনাথ এবং আরও অনেকে।

ঢাকেশ্বরী মন্দির ছাড়াও জন্মাষ্টমী উৎসব পালিত হয় ইসকন মন্দির, শ্রীশ্রীগীতাসঙ্ঘ, প্রভু জগদ্বন্ধু মহাপ্রকাশ মঠ, রামসীতা মন্দির, রমনা কালীবাড়ি ও মা আনন্দময়ী আশ্রম, গৌড়ীয় মঠ ও মন্দির, রাধাগোবিন্দ জীউ ঠাকুরমন্দির এবং অন্য বিভিন্ন মন্দিরেও। ঢাকেশ্বরী মন্দিরপ্রাঙ্গণে আলোচনাসভায় সভাপতিত্ব করেন বীরেশ চন্দ্র সাহা। শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া, সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী প্রমোদ মানকানি সাংসদ মুস্তাফা জালাল মহীউদ্দিন প্রমুখ আলোচনাসভায় যোগ দেন। ১ সেপ্টেম্বর বিকেল তিনটায় এক ঐতিহাসিক শোভাযাত্রা বের হয়েছিল ঢাকেশ্বরী মন্দিরে প্রাঙ্গণ থেকে। আবালবৃদ্ধ বনিতা সুসজ্জিত হয়ে বিভিন্ন ট্যাবলো সহ ওই শোভাযাত্রায় যোগ দেন।

তবে রমজান মাস চলার জন্য প্রধানমন্ত্রী বিকেল পাঁচটার মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ করতে বিবৃতি দিয়েছিলেন।

বিহার বিধানসভা নির্বাচন

বৈতরণী উতরোতে ভরসা সমাজবিরোধীরাই

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই বিহারের মাটিতে দৌরাত্ম্য বাড়ছে সমাজ বিরোধীদের। নির্বাচন-পূর্ব পরিস্থিতিতে বেশ কোণঠাসা অবস্থায় থাকা আর জে ডি এবং কংগ্রেস যার ফায়দা লুটতে পুরোপুরি আসরে নেমে পড়েছে। গত ২৭ আগস্ট আর জে ডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদব সিওয়ান জেলে তার দলেরই পুরোনো এম পি এবং অধুনা নীতিশ কুমারের ঘনিষ্ঠ সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। লালুর বক্তব্য, রমজানের সময়ে এটা নেহাতই সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার। অন্তত তিন ডজন অপরাধমূলক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত সিওয়ানের কুখ্যাত 'সুলতান' সাহাবুদ্দিন-এর সঙ্গে লালুর বিরোধের মূল কারণ প্রভুনাথ সিং। সাহাবুদ্দিন লালুর ওপর মারাত্মক চটে যায় যখন দেখে

তসলিমুদ্দিন

প্রভুনাথ সিং শুধু বহাল তবিয়তে আর জে ডি-র সঙ্গে যুক্তই হননি, উপরন্তু তার খাসতালুক সিওয়ানে বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে আসনের জন্য টিকিট বিতরণ করতে শুরু করেছেন। সাহাবুদ্দিনের সন্দেহ, সে যখন ওই এলাকার ডন তখন লালুপ্রসাদের প্রচ্ছন্ন মদত না পেলে প্রভুনাথের পক্ষে এহেন 'গর্হিত' কাজটি করা কখনওই সম্ভবপর হোত না।

বিহারের বিধানসভা নির্বাচনে 'মুসলমান ভোট' একটা বড় ফ্যাক্টর। এই ভোটের একটা বড় অংশই এযাবৎকাল লালুর পেছনে ছিল। এবার তাতে থাবা বসিয়েছে নীতিশ কুমারের সংযুক্ত জনতা দল। আর জে ডি বিধায়িকা বিমা ভারতীর কুখ্যাত অপরাধী স্বামী অবধেশ মণ্ডলের ফৈজান গ্যাং এতকাল সন্ত্রাস চালিয়েছে রপাউলি এলাকায়। বিমা ভারতী ওখানকারই বিধায়িকা। এলাকায় সন্ত্রাস অব্যাহত কিন্তু বিমা ভারতীর দলবদলের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যেই। কারণ জে ডি (ইউ) বিহারের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এবং তিনি সেই আমন্ত্রণে সাড়াও দিয়েছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ভোটের আগে লালুর হালৎ খারাপ বুঝেই নীতিশের দিকে ঝুঁকছেন আর জে ডি-রই একাংশ। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, যাঁরা লালুকে ছেড়ে নীতিশের দিকে আসতে চাইছেন, তাঁদের অতীত রেকর্ড অতীব খারাপ। তবে বিমা ভারতী তাঁর স্বামীর মদতে রাজনৈতিকভাবে পাল্টি খেলেও 'মাসলম্যান'দের নিয়ে লালুপ্রসাদ যাদব বনাম নীতিশ কুমারের যুদ্ধে, এখনও পর্যন্ত খানিকটা হলেও লালুই এগিয়ে। কারণ প্রভুনাথ সিং-এর পাশাপাশি আনন্দমোহন সিং-এর সমর্থনও এ ব্যাপারে আদায় করে নিতে পেরেছেন আর জে ডি সুপ্রিমো। জেল-বন্দী আনন্দমোহনের নামেও একাধিক দুর্নীতি ও খুনের মামলা ঝুলছে। তবে এই আনন্দমোহনও লালুর কিছুটা হলেও

আনন্দমোহন

মাথাব্যথার কারণ। যেহেতু প্রকাশ্যে আর জে ডি-কে তার সমর্থনের কথা ঘোষণা করেনি আনন্দমোহন। বরং লালু-ই উদ্যোগী হয়ে সংবাদমাধ্যমের কাছে আনন্দমোহনকে তার পাশে পাবার কথাটা জানিয়ে দিয়েছেন। তবে এটা নিশ্চিন্তে বলা যায়, আনন্দমোহন আর প্রভুনাথকে বাজি রেখে বিহারের ভোট বৈতরণী পেরোতে চাইছেন লালুপ্রসাদ যাদব।

দুর্নীতি আর অপরাধের এমন ভোট-বাজারে এই মওকা ছাড়তে রাজি নয় কংগ্রেসও। জেলে গিয়ে কিছুদিন আগেই আনন্দমোহনকে দেখে এসেছেন রাজ্য কংগ্রেসের প্রধান মেহবুব আলি কেইসার। দেখার পর তাঁর মন্তব্য, "আমরা আশা করছি আনন্দমোহন তাঁর সাহায্যের হাত (ভোটে) আমাদের দিকে বাড়িয়ে দেবেন। কারণ তাঁর স্ত্রী লাভলি আমাদের পার্টির মধ্যেই রয়েছেন।" আনন্দমোহনকে কংগ্রেস চাইছে আরও একটা কারণে। কারণটা পরিষ্কার। যেহেতু রাজপুত ভোটব্যাঙ্ক ইদানীং নীতিশের করায়ত্ত, সেহেতু আনন্দমোহনকে দিয়ে তা পুনরুদ্ধারের একটা প্রচেষ্টা চালাবে কংগ্রেস। বিহারের কোশী এলাকায় ভোটে রাজপুত সম্প্রদায়ের দারুণ প্রভাব রয়েছে। ২০০৫-এর বিহার বিধানসভা নির্বাচনে এই এলাকার অধিকাংশ ভোটই নীতিশের ভোটবাক্সে জমা পড়ে। যদিও সে-সময় আনন্দমোহনের সমর্থন নীতিশের দিকেই ছিল।

নীতিশের কাজকর্মের প্রবল সমালোচক বিহার বিজেপিও, এমনকী জে ডি (ইউ)-এর একাংশও নীতিশের কাজকর্ম পছন্দ করছেন না। বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য— 'রাজনৈতিক মনস্তত্ত্ব' বলে একটা ব্যাপার আছে; তিনি যা করছেন সেটাও একপ্রকার 'রাজনৈতিক মনস্তত্ত্ব'। এতে বিপক্ষকে ঘাবড়ে দিতে নাকি খুব সুবিধে হয়। তবে নীতিশ যেভাবে অনুপ্রবেশকারী অধ্যুষিত কিষাণগঞ্জ এলাকার কুখ্যাত সমাজবিরোধী মহম্মদ তসলিমুদ্দিনকে নিয়ে আনন্দমোহনের সহর্ষের বাড়িতে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন, তাতে রাজনৈতিক মহলেরই ভ্যাবাচাকা খেয়ে যাওয়ার অবস্থা হয়েছিল! আগে বিহার রাজনীতিতে সমাজবিরোধীরা শুধুমাত্র নিজেরা টিকিট পেলেই সন্তুষ্ট হোত, ইদানীংকালে তারা রাজনৈতিক দলগুলোকে একটা লম্বা তালিকা ধরিয়ে দিচ্ছে তাদের পছন্দের প্রার্থীদের। সম্ভবত এনিয়ে গোলমাল হওয়াতেই নীতিশের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন আনন্দমোহন, এমনটাই অনুমান রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের। তাঁরা এও মনে করছেন, নীতিশ আসলে আনন্দমোহনের তালিকাভুক্ত দুর্নীতিগ্রস্তদের বেশি পাত্তা দিতে চাননি। তিনি আনন্দমোহন, তসলিমুদ্দিন, সাহাবুদ্দিনদের যেটুকু গুরুত্ব দিচ্ছেন তা স্রেফ ভোটের স্ট্রাটেজি হিসেবে। নির্বাচনে জিতলে রাজ্যের উন্নয়নের বলয়ের ত্রি-সীমানায় এইসব কুখ্যাত সমাজবিরোধীদের আর যেতেই দেবেন না।

গত বছর বিধানসভা ভোটে, অন্তত ৮২

সাহাবুদ্দিন

জন প্রার্থীর নামে ছিল খুন করার অভিযোগ, খুন করার চেষ্টার অভিযোগ ছিল ১৭০ জন প্রার্থীর নামে। এবং স্বাধীনতার দীর্ঘ অর্ধ-শতক পরেও দেশের সবচেয়ে দুর্ভাগ্য হলো, রাজনৈতিক দলগুলোর প্রকাশ্য মদতে এইসব কুখ্যাত অপরাধীরা নির্বাচনে জিতে যান। নির্বাচনী বৈতরণী উতরোনোর সেই ট্র্যাডিশন এইবারের বিহার বিধানসভা ভোটেও অব্যাহত।

অমিত শাহ-কে ফাঁসাতে কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্ত ব্যর্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ অ্যাপেক্স কোর্টে দাঁড়িয়ে গুজরাটের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অমিত শাহ সরাসরি অভিযোগ করেছেন, "১২ জানুয়ারি, ২০১০-এ সুপ্রিম কোর্ট যখন সোহরাবউদ্দিন এনকাউন্টার মামলা সিবিআই-এর হাতে তুলে দিলেন তখনই আমার মনে হয়েছিল এর পেছনে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক, কেন্দ্রীয় সরকার এবং সিবিআই-এর একটা 'বড় চুক্তি' (বিগ ডিল) রয়েছে।" ৮৯ পাতার পিটিশনে অমিত শাহ একটি আন্তর্জাতিক অপরাধের বিচার চলাকালীন চিলি-র ডিরেক্টর অগস্টো পিনোচেট-এর সেই বিখ্যাত উক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেন। যেখানে পিনোচেট বলেছিলেন, যখন আদালত কোনও ব্যাপারে পক্ষপাতদুষ্ট (বায়াসড) হয়ে পড়বে তখন বিচার ব্যবস্থাকে অন্যত্র স্থানান্তরকরণ করাই বাঞ্ছনীয়। পক্ষপাতিত্বের নিদর্শন হিসেবে ১২ জানুয়ারি, '১০ সুপ্রিম কোর্টের সেই আদেশের পাশাপাশি ১১ আগস্ট, '১০-এ সুপ্রিম কোর্টের সিবিআইকে আরও তিনমাস অতিরিক্ত সময় দেবার কথাও স্মরণ করিয়ে দেন তিনি। অমিত শাহের হয়ে আদালতী ময়দানে নেমেছেন বিশিষ্ট আইনজীবী রাম জেঠমালানী। তাঁর শাণিত যুক্তি, "সুপ্রিম কোর্টের যে বিচারক (তরুণ চ্যাটার্জী) নিজেই প্রভিডেন্ট ফান্ড (পি এফ) কেলেঙ্কারিতে জড়িত বলে জনসমক্ষে বিতর্কিত এবং সিবিআই-এর নজরদারিতে রয়েছেন, তিনিই কিভাবে তদন্তের আদেশ দেন সিবিআই-কে?" প্রসঙ্গত, পি এফ দুর্নীতিতে যুক্ত থাকার সন্দেহে সদ্য অবসর- প্রাপ্ত ওই বিচারপতি তরুণ চ্যাটার্জী সিবিআই-এর কড়া নজরে রয়েছেন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, সুপ্রিম কোর্টের যে ডিভিশন বেঞ্চ গুজরাটের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র-প্রতিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সোহরাবউদ্দিন এনকাউন্টার মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল সেই ডিভিশন বেঞ্চের প্রধান হিসেবে অবসরের মাত্র দু'দিন আগে নিযুক্ত হয়েছিলেন তরুণ চ্যাটার্জী। রাজনৈতিক মহলের মতে, তরুণবাবুকে রাজনৈতিকভাবে কাজে লাগাবার পরিকল্পনা করেছিল কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার। এঁদের বিশ্লেষণে যে তেমন কোনও গলদ ছিল না তার প্রমাণ— অবসরের দিন কয়েক আগেই কেন্দ্রীয় সরকার তরুণবাবুকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আন্তঃ রাজ্যসীমা বিবাদ

নিরসনে গঠিত এক কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করে দেয়। এখন উত্তর-পূর্বের একটি রাজ্য নাগাল্যাণ্ডের অ্যাডভোকেট জেনারেল কে এন বালগোপাল প্রশ্ন তুলেছেন, যে বিচারপতি ওই পদটি অনুমোদন করেছিলেন তিনি নিজেই কিভাবে সেই পদেই অধিষ্ঠিত হন? সুতরাং একটা রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা বা বাধ্যবাধকতা থেকেই যে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হওয়া সত্ত্বেও তরুণ চ্যাটার্জী অমিত শাহের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করেছেন আজ তা সূর্যালোকের মতোই স্পষ্ট।

প্রসঙ্গত, সিবিআই-এর হেফাজতে যাওয়ার পর অসুস্থ হওয়ার জন্য গত ১ সেপ্টেম্বর অমিত শাহকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁর জামিনের আবেদন এখনও বিচারাধীন। সিবিআই ইতিমধ্যেই গত ২৩ জুলাই শাহের বিরুদ্ধে দু'হাজার পাতার চার্জশিট দাখিল করেছিল। তাতে তাঁর বিরুদ্ধে হত্যা, অত্যাচার চালানো, অপহরণ এবং অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। এমনকী ভারতীয় পিনাল কোডের বিভিন্ন ধারায় তাঁর নামে অভিযোগ আনার পাশাপাশি-ই তথ্য-প্রমাণ লোপাট করার অভিযোগও হেনেছিল সিবিআই। কিন্তু শাহ স্পষ্টই জানিয়েছিলেন, সিবিআই তাঁকে আত্মপক্ষ সমর্থনের বিন্দুমাত্র সুযোগ দেয়নি। অমিত শাহের বিরুদ্ধে চার্জশিট আনতে যতটা ব্যগ্র ছিল, সেই অভিযোগগুলো প্রমাণ করতে ঠিক ততটাই ব্যর্থ। আর তরুণ চ্যাটার্জী কেলেঙ্কারী প্রকাশ্যে আসতে গুজরাত সরকার তথা নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে কংগ্রেসের প্রতিহিংসাপরায়ণ রাজনীতি ব্যুমেরাং হয়ে গেল বলে রাজনৈতিক মহলের অভিমত।

তোমার চরন চিহ্ন ধরি

তুষারকান্তি ঘোষ

বিশ্ববিখ্যাত ঔপন্যাসিক অর্নেস্ট হেমিংওয়ে তাঁর অনবদ্য উপন্যাস "ডেথ ইন দি আফটারনুন"-এ বলেছেন, "সরল ভাষায় কিছু লিখলে লেখকের মধ্যে কোনও ফাঁকি থাকলে তা সহজেই ধরা পড়ে। আর ভাষার মারপ্যাঁচ দিয়ে লিখলে রচনার অন্তঃসারশূন্যতা কিছুকাল ঢেকে রাখা যায়।" মাননীয় বংশীদার তিরোধানের পর কিছু লিখতে যাওয়ার সময় এই ভাবনাটা বিশেষভাবে মনের মধ্যে খোঁচা দিচ্ছে। যে বংশীদার সাথে আমার আবাল্য পরিচয়, যাঁকে আমি সুদীর্ঘকাল কাছ থেকে দেখেছি, যিনি তাঁর অজস্র কাজের মধ্যে আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলে যেতেন বিভিন্ন স্থানে, যাঁকে মা নিজের 'বড়পুত্র' বলে মর্যাদা দিয়েছিলেন—সেই কাছের প্রাণবন্ত মানুষটির সম্পর্কে কিছু লেখার আগে এই চিন্তাই মনে উদিত হচ্ছে— সঠিক হবে তো তাঁর সম্পর্কে স্মৃতিচারণা?

ঁবংশীলাল সোনীকে আমরা বংশীদা বলেই ডাকতাম। সমাজ তাঁকে এই সহজ নামেই চিনত— 'বংশীদা' নামের ক্ষেত্রটা বিশাল ছিল। বংশীদা ১৯৫৫ সালে মালদহে প্রচারক হয়ে এলেন। এই পাঁচের দশকে মালদহের পরিমণ্ডলে প্রাক-স্বাধীন সংঘকাজের গৌরবশশী ক্ষীণ হয়ে এসেছে। ভারতভাগের সময় মালদহের উত্তেজনাকর ঐতিহাসিক দিনগুলোর সাথে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তার মধ্যে মুরলীধর নায়ক তখন এক লঞ্চ কোম্পানীতে কাজ করতেন। শনিবার মালদহে আসতেন। শ্রী নারায়ণ গিরি তখন জেলা কার্যবাহ। বংশীদার সাথে আমার পরিচয় কয়েকমাস পরেই। নিবাসে বংশীদা থাকতেন একটা হলঘরে। রাত্রিতে বিছানা পাততেন। ভোরে সেটা গুটিয়ে রেখে দিতেন। ঘুমোতেন মেঝেতে। বর্তমান নিবাসের মাঝের ঘরে থাকতেন তুষারকান্তি পাল। উমেশচন্দ্র বাস্তুহারা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। বিস্তারক রূপে ছিলেন। অল্প বেতনে তাঁর আর চলছিল না— তিনি একদিন ছেড়ে চলে গেলেন মালদহ। বংশীদা রইলেন একা। গোটা জেলাটা সামলানোর জন্য। বংশীদার সময় সান্ধ্যকালীন শাখা হতো কালীতলায়। মুখ্য শিক্ষক সৌরেনদা (সৌরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী)। শাখায় নিত্য ঝামেলা হোত পাশের ক্লাবগুলোর সাথে। পুরাটুলীতে হোত প্রভাত শাখা। চালাতেন নকুলদা (দাস)। অভিরামপুরে চালাতেন জিতুদা (জিতেন ঘোষ)। কুতুবপুরে চালাতেন জীবুদা (জীবেন্দ্রনাথ পোদ্দার) আর শান্তিদা (সনৎ কুমার দাস)। কিছুদিনের মধ্যে বংশীদার উদ্যোগে দুটো সায়ম্ শাখা হলো রামকৃষ্ণ কলোনীতে। চালাতেন হিরন্ময় পাণ্ডে আর গয়েসপুরে ভবতোষ গোস্বামী। বালুচরে রাপার মাঠে চলত একটি শাখা। ভুবনেশ্বর দাসের নেতৃত্বে। এখানে আসতেন সানুদা (প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নায়ক নির্মল কুমার)। এছাড়া বড় মাঠে (ডি. এস. ও.-র পরবর্তী মাঠ) প্রভাত শাখা চালাতেন অজিত দা (অজিত মৈত্র)। পুরাটুলীতে প্রভাত শাখা চালাতেন নারুদা (নলিনী রঞ্জন ভৌমিক)। জয়দেবদা সায়ম বিভাগের কাজ দেখতেন। জয়দেবদা শাখায় এলে খুব ভাল লাগত, কারণ তিনি আমাদের জন্য নতুন নতুন গান লিখতেন, সুর দিতেন। জয়দেবদার (শ্রী অহীন্দ্র কুমার দে) এই সঙ্গীত প্রতিভা চলচ্চিত্র জগৎ যদি পেত তবে তিনি এক অতি বিখ্যাত সুরকার ও গীতিকার হতে পারতেন।

মালদহে এই পরিবেশ থাকল না। বংশীদার অনুপ্রেরণায় ভুবনদা ১৯৫৬-এ এবং জয়দেবদা ১৯৫৭-তে প্রচারক হয়ে চলে গেলেন। প্রথমজন কুচবিহারে দ্বিতীয়জন নবদ্বীপে। ইতিমধ্যে জনসংঘ প্রতিষ্ঠার ফলে নিত্য কাজের জন্য রাজনৈতিক সংগঠনকে শক্তিশালী করার বিষয়ে অজিতদা ও নীরুদা জনসংঘে চলে গেলেন। ফলে ওই শাখাগুলো অচল হয়ে গেল।

বংশীদা জানতেন সঙঘকার্যের বিস্তারের জন্য প্রথম চাই কার্যকর্তা। এবং এই কার্যকর্তা তৈরি হয় সম্পর্কের মাধ্যমে। ব্যক্তিগত সম্পর্ক গভীরতর না হলে তাদের উপর আদেশ চলে না। ফলে বংশীদা শহরের ও গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়ীতে মিশতেন। এই মেশার মাধ্যম ছিল বিভিন্ন বাড়ীতে ভোজনের ব্যবস্থা। প্রায় সব স্বয়ংসেবকই বংশীদাকে খাওয়ার জন্য ডাকতেন। কোনও স্বয়ংসেবকের আহ্বান তিনি উপেক্ষা করতেন না। মালদহ শহরে ও কেশপুরের কিছু স্বয়ংসেবক হরিজনের কাজ করতেন। তাঁদের মধ্যে দুই একজন কার্যকর্তাও হয়েছিলেন। বংশীদা সেই বাড়ীগুলোতেও যেতেন। আমিও তাঁর সাথে গিয়েছি। কোন দ্বিধা ছিল না তাঁর। আজ মনে হয় বংশীদা যেন বলছেন, "I try to make the catholic Universe of evil perceptible odorous. The theologians give us all abstract idea of the sinner, I give him flesh and blood."

বাড়ীগুলোর সঙ্গে বংশীদার সহজাত সম্পর্ক ছিল। বংশীদা কলকাতার এক রক্ষণশীল বনেদী পরিবারের মানুষ ছিলেন। অথচ তিনি শিখেছিলেন সমাজের স্তর বিন্যাসকে ভেঙ্গে কিভাবে স্বয়ংসেবকদের বাড়ীর মধ্যে এক সমান্তরাল সমাজ তৈরি করতে। মালদা জুড়ে বংশীদার সহস্র সহস্র মাসিমা ছিলেন, মেসোমশায় ছিলেন। বোন ছিল, ভাই ছিল, দাদা ছিল, বৌদি ছিল। বংশীদার মৃত্যু সংবাদে মালদহের সব বাড়ীগুলো স্তব্ধ হয়ে যায়।

লোকসংগ্রহ প্রচারকের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠগুণ। লোকসংগ্রহের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল বংশীদার। তিনি সঙঘ কাজের প্রচার ও লোকসংগ্রহ একই মুদ্রার দুটি পিঠ বলে জানতেন। কোনও একটি পিঠ অচল হলে মুদ্রা চলে না। তিনি প্রথমে সংঘকার্য বিস্তারের জন্য কতকগুলি শ্রেষ্ঠ ও প্রভাবশালী গ্রাম বেছে নিতেন। তারপর সেখান থেকে কাজের পরিধি বিস্তার করতেন। ১৯৬১-তে আইহো হাইস্কুলে শীতকালীন শিবির হলো। সভাপতি করে আনলেন ঁহরিদাকে (শ্রী হরিপ্রসন্ন মিশ্র)। তখনও তিনি হিন্দু মহাসভার নেতা। প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী ঁশিবেন্দুশেখর রায়ও হিন্দু মহাসভার নেতা ছিলেন। দুইজনকেই তিনি ধরলেন সংঘের স্রোতে নিয়ে আসবেন বলে।

আইহো গ্রামে শীতকালীন শিবিরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছিল। ছিল ভয়ংকর ঠাণ্ডা। মাননীয় অমলদা প্রান্তীয় প্রচারক রূপে সেই শিবিরের সমারোপ উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। তখন গোয়া ভারতের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। অমলদা (শ্রী অমল কুমার বসু) ও বংশীদার প্রভাবে হরিদা জনসংঘের দায়িত্ব নিতে রাজী হলেন। বিনয়দা (বিনয় ভূষণ সরকার) তখন মালদহে এসেছেন। মালদহে জনসংঘ গঠিত হলো।

এই শিবিরের পর আইহোতে বিস্তারক এলেন গোবিন্দদা (শ্রী রাধাগোবিন্দ পোদ্দার)। বুলবুলচণ্ডীতে জ্ঞানদা (শ্রী জ্ঞানেন্দ্রলাল ব্যানার্জি)। এই দুইটি গ্রামকে কেন্দ্র করে বংশীদা বরেন্দ্রভূমি জয় করতে বের হলেন। আইহো-কে কেন্দ্র করে মুচিয়া, সিংহাবাদ, তিলাসন, ঋষিপুর, কলাইবাড়ী, সরিষাবাড়ীতে কাজ বৃদ্ধি পেল। বুলবুলচণ্ডীকে কেন্দ্র করে কেন্দুয়া, হবিবপুর, কেশপুকুর, মোদীপুকুর, পাকুয়া, বামনগোলা, নালাগোলা অবধি চলে গেল কাজের বিস্তার। সংঘের শাখা বিস্তারের সাথে সাথে তিনি সেইসব স্থানের বিশিষ্ট কোনও নাগরিক বা সজ্জনকে সঙেঘর অভিভাবক করে দিতেন। এঁদের কোনও পদ ছিল না। অর্থাৎ তাঁরা কার্যবাহ বা সঙঘচালক ছিলেন না কিন্তু এঁরা সঙেঘর অভিভাবক রূপে কার্যকর্তাদের নিকট স্বীকৃত ছিলেন। যখন আইহো হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বৃন্দাবন দাস, ঘোষপুরে রেবতী ঝা, বুলবুলচণ্ডীর খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ ভূপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য, বস্ত্র ব্যবসায়ী দ্বিজপদ রায়, কেশপুকুরের গ্রাম প্রধান অমরেন্দ্রনাথ মোওয়ার (বাদলদা)। ঠিক এই ভাবেই বংশীদা অমৃতি, রায়গ্রামকে কেন্দ্র করে চলে গেলেন বাঁশীটোলা, দুর্লভপুর, হাড়িয়াগড়, বিনোদপুর, কাজীগ্রাম, সাট্টারী। এই ক্ষেত্রের অভিভাবক করলেন রায়গ্রাম হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ঁরাজেন্দ্র সিংঘ সিংঘী, নাজিরপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামী গান্ধীবাদী নেতা ঁপশুপতি ঝা। মালতীপুরকে কেন্দ্র করে সামসী, গোবিন্দপাড়া, মকদুমপুরে কাজের বিস্তার হলো। এই এলাকার অভিভাবক অঞ্চ ল প্রধান ঁঅমরেন্দ্র সরকার ছিলেন সঙঘ কার্যের বিস্তারের সহায়ক। এইসব ব্যক্তিরা অনেকেই কংগ্রেসের বা অন্য মতাবলম্বী ছিলেন। বংশীদার ব্যক্তিত্বের স্পর্শে এসে তাঁরা সংঘের আদর্শে পথের দিশা খুঁজে পেয়েছিলেন। কলিগ্রাম, চাঁচল, বগচরা, মোতিহারপুর এই সব কেন্দ্রে ঁঅমলকৃষ্ণ গোস্বামী, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, রামলাল লাহিড়ী সঙেঘর অভিভাবক ছিলেন। এই অভিভাবকেরা স্থানীয়ভাবে সকলেই বয়স্ক ও সমাজে পরিচিত ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি এঁদের বেশকিছু জনকে সঙঘ বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে এনেছিলেন। লোকসংগ্রহের এক অপূর্ব ক্ষমতা তাঁর মধ্যে ছিল। তিনি যখন কোনও গ্রামে শাখায় ভ্রমণ করতেন সেই গ্রামে সন্ধ্যেবেলায় অভিভাবক ও বিশিষ্ট নাগরিকদের বৈঠক হোত। এই বৈঠকে তিনি অপূর্বভাবে দেশের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতেন। মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মতো তা শুনতেন। এইসব ব্যক্তিদের এরপরে সঙেঘর শাখার সাথে যুক্ত করতেন এবং সংস্কার দিয়ে কার্যকর্তা তৈরি করতেন। বংশীদার আমলে অজস্র বয়স্ক কার্যকর্তা সঙেঘর কাজের সংস্পর্শে এসেছিলেন।

তিনি বিশ্বাস করতেন সম্পর্ক স্থাপন মানুষের হৃদয়কে প্রসারণ করে। কার্যকর্তাদের বৈঠকে বলতেন, "If the two hearts are combined, they can burst a mountain." তাই বংশীদাকে দেখেছি সিপিআই (তখন সি পি এম হয়নি)-এর নেতাদের কাছ থেকে তাঁদের পরিচালিত বিদ্যালয়ে শীতকালীন শিবির করার অনুমতি আদায় করে নিতেন— তাঁরাও তাঁর ব্যক্তিত্বে মোহিত ছিলেন।

অথচ এই বিস্তারের জন্য কী কষ্টই না তিনি স্বীকার করেছিলেন। ১৯৬১-তে আমার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হলো। এপ্রিলের শেষে আমাকে নিয়ে চললেন বুলবুলচণ্ডীতে। দিন ১৫ রেখে শাখাটা আরম্ভ করবেন। বুলবুলচণ্ডী যাওয়ার একমাত্র উপায় মালদহ কোর্ট স্টেশন থেকে সিংহাবাদগামী ট্রেন। দিনে দু'বার। বিকেলের ট্রেনে আমি আর বংশীদা গেলাম। বুলবুলচণ্ডী স্টেশন থেকে নির্জন পথ পার হয়ে যে বাড়ীতে আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল সেই বাড়ী তালাবন্ধ। অনেকক্ষণ রারান্দায় বসে থাকলাম। রাত্রি হয়ে আসছে কোথাও থাকার ব্যবস্থা নাই। পরিচিতও কেউ নাই। বংশীদা ফিরে এলেন স্টেশনে। খবরের কাগজ পেতে বললেন "তুষার শুয়ে পড়। সকালে দেখা যাবে।" আমি আর বংশীদা প্ল্যাটফরমের উপর শুয়ে পড়লাম। গভীর রাতে রেলওয়ে পুলিশ লাঠি ঠকঠক করে আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে হম্বিতম্বি করতে লাগল। মুহূর্তেই বংশীদা নিজের স্বরূপ ধরলেন। দুচার মিনিট ইংরাজীতে ধমক দিলেন। চিৎকার শুনে স্টেশন মাস্টার ছুটে এলেন। বংশীদা তাকে নিজের পরিচয় দিলেন। স্টেশন মাস্টার বংশীদাকে ও আমাকে টিকিট ঘরে নিয়ে গেলেন। ওই ঘরের বড় টেবিলে আমাদের শোবার ব্যবস্থা করে দিলেন। রাত কেটে গেল। সকালে সেই বাড়ীতে গেলেন বংশীদা। তাঁদেরকে গত রাতের কথা কিছুই বলেননি। অথচ এই বুলবুলচণ্ডীতে বংশীদাকে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন জমিদার জগন্নাথ রায়। বেশ কিছুদিন তাঁর বাড়ীতেই বৈঠক হতো। পরে বংশীদা ও কার্যকর্তারা থাকতেন তরণী সাহার বাড়ীতে। তরণীর পিতামাতা বংশীদাকে খুব্ই ভালবাসতেন। তরণীর পরিবার ছিল নিম্ন মধ্যবিত্ত। কিন্তু তাঁর বাড়ীই ছিল "বিনা পয়সার নিবাস। বিনা পয়সার হোটেল।"

অনুশাসন ছিল বংশীদার জীবনের প্রধান স্তম্ভ। সঙেঘর শাখায় হোক বা শীতকালীন শিবির হোক কিংবা সঙঘ শিক্ষাবর্গ হোক— সর্বত্রই তিনি ছিলেন যুদ্ধ জয়ের সেনাপতি। স্বয়ংসেবকদের নেপোলিয়নের কথা বলতেন। নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ জয়ের জন্য এগিয়ে যাচ্ছে। সামনে পড়ল আল্পস্ পর্বতমালা। সেনাপতি বললেন নেপোলিয়নকে "Sir, There are the Alps." নেপোলিয়ন গম্ভীর স্বরে বললেন "There are no Alps." অনুশাসন যাদের জীবনের ভিত্তি তাদের সামনে কোনও পর্বতমালা বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। বংশীদা যেসব শিবিরে থাকতেন সেইসব শিবিরগুলো মনে হোত সৈন্য শিবির। ভোরে বিউগল বাজলে বংশীদা সব ঘরে গিয়ে দেখতেন কেউ শুয়ে আছে কিনা? বংশীদা কক্ষে আসছেন শুনলে স্বয়ংসেবকেরা লেপ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রাতঃকৃত্যের জন্য প্রস্তুত হতো।

বাঁকুড়াতে ১৯৬৯-এর দিকে কার্যকর্তা শিবির হবে। বন্যায় পথ বন্ধ। আমরা ১২।১৪ জন রাজমহল দিয়ে গঙ্গা পার হয়ে তিন পাহাড় ধরে যাব। বিকালে ঘাটে পৌঁছে দেখলাম লঞ্চ নাই। কোনও কারণে সেদিনের লঞ্চ সার্ভিস বন্ধ। আমরা বললাম, 'বংশীদা, বাড়ী ফিরে যাই, সকালের বাস ধরে এসে দশটার লঞ্চ ধরি।' বংশীদার হুকুম বাড়ী যাওয়া চলবে না। মাণিকচক ঘাটে ভরা গঙ্গার পাশে একটা পরিত্যক্ত জংলা বাড়ী পরিষ্কার করে রাতটা ওখানেই কাটিয়ে দিলেন। সকালের লঞ্চে আমরা পার হয়ে চললাম বর্ধমান। ওখান থেকে বাঁকুড়া। বংশীদা জীবনটাকে একটা অ্যাডভেঞ্চার রূপেই দেখতেন। যাঁরা সমাজ ও দেশ হিতে কাজ করেছেন তারা জীবনকে এই ভাবেই দেখেছেন।

১৯৬৪ সাল, ডিসেম্বর মাসের ৩০ তারিখ। বর্ধমানে বাঁকা নদীর পাশে আমবাগানে কার্যকর্তাদের শিবির হচ্ছে। সন্ধ্যার পর পূজনীয় গুরুজীর ভাষণ। মাথার উপর কোন আচ্ছাদন নাই। আকাশে বর্ষার মেঘ। বাতাস বইতে লাগল। কানে মাফলার দেওয়া নিষেধ। প্রায় ৬০০ জন কার্যকর্তা আমরা মাটিতে বসে গুরুজীর ভাষণ শুনেছি। এমন সময় বৃষ্টি শুরু হলো। ভয়ঙ্কর শীত তার উপর বৃষ্টি। গুরুজী উঁচু চৌকিতে বসে আছেন। চৌকির নীচে অমলদা। গুরুজী বৃষ্টি পড়া শুরু হতেই ভাষণ থামিয়ে অমলদাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কি অমল, ভাষণ বন্ধ করে দিব?" আমরা কান খাড়া করে শুনছি অমলদা কি বলেন। গুরুজীর প্রশ্নে বিস্মিত হয়ে অমলদা বললেন, "কেন ভাষণ বন্ধ করবেন?" গুরুজী হাসলেন;বললেন, "বেশ ভাষণ চলুক।" গুরুজী ৪৫ মিনিট ভাষণ দিলেন। জল আর ঝড়ে টেন্ট-এর সব বিছানা ভিজে গেল। এক ভয়ঙ্কর দুর্বিপাক। আমরা ভিজে জবজবে হয়ে গিয়েছি। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, গুরুজী ভিজছেন।

ভোজন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে গেল। সূচনা দেওয়া হলো রাত্রে ভোজনের কোনও ব্যবস্থা থাকবে না। গুরুজীর ভাষণ শেষে সকলে তাঁবু থেকে জল বের করতে শুরু করলো। বংশীদা আমাকে বললেন, "তুই তাঁবুর পাশ দিয়ে কয়েকজনকে নিয়ে ট্রেঞ্চ তৈরি কর। আর জল বের কর। আমি আসছি।" বংশীদা নকুলদাকে নিয়ে কোথায় চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর ফিরলেন। দেখলাম ওনার হাতে পাউরুটি আর মিষ্টি। বংশীদা সবাইকে রাতের খাবার তুলে দিচ্ছেন। বংশীদা আমাকে বললেন, "The soldiers cannot live only with his valour, they require penny a day." বংশীদার অনুশাসন ছিল হৃদয়ের প্রেমে সঞ্জীবিত। তাই বংশীদা যুদ্ধ জিততেন।

বংশীদা স্বয়ংসেবকদের আদর্শবাদে উদ্দীপ্ত করার জন্য দৈনন্দিন কার্যক্রম নিতেন। নিবাসে তখন ইজরায়েলের এমব্যাসী থেকে একটা পত্রিকা আসতো— তার নাম 'ইস্রায়েল'। ইংরেজী পত্রিকা। আসত organiser ও স্বস্তিকা। বংশীদার ইচ্ছায় আমরা সবাই স্বস্তিকার অঙ্কুর বিভাগে সদস্য হয়েছিলাম। বংশীদা organiser থেকে অনুবাদ করে ঘটনাগুলো বলতেন। বলতেন 'Israel' থেকে। আরব দেশের সাথে গাজা স্ট্রিপ দখলের লড়াই চলছে ইস্রায়েলের। ইস্রায়েলের সৈন্যবাহিনীর উপর আদেশ এল এগিয়ে যেতে

(এরপর ৯ পাতায়)

তোমার চরণ চিহ্ন ধরি

মননে বংশীলাল সোনী

(৮ পাতার পর)

হবে। সৈনিকেরা ট্রেঞ্চে । উল্টো দিক থেকে গোলাগুলি আসছে। সামনের পিল বক্সগুলো দখল করা চাই। সৈনিকেরা বিভ্রান্ত— কিভাবে এগোবে? হঠাৎ আদেশ এল, "এগোও, আমি তোমাদের সাথে আছি।" সৈনিকেরা তাকিয়ে দেখলেন—ইস্রায়েলের প্রধান সেনাপতি মোশে দায়ান ট্রেঞ্চে । উদ্দীপ্ত সৈন্যবাহিনী গোলাগুলি উপেক্ষা করে গাজা স্ট্রিপ দখল করল।

বংশীদা আদর্শবাদী সাহিত্য পড়বার জন্য স্বয়ংসেবকদের উদ্দীপ্ত করতেন। এই জন্য নিবাসের গ্রন্থাগারে প্রচুর বই সংগ্রহ করেছিলেন বাড়ী বাড়ী গিয়ে। বিপ্লবীদের জীবনী পড়তে বলতেন। বংশীদা একটা খাতা রাখতেন তাতে সম্ভাবনাপূর্ণ স্বয়ংসেবকদের নামের তালিকা ছিল। তারপাশে অজস্র ঘরকাটা ছিল। সেই ঘরের উপর লিখা থাকত— মহাভারতের পথের দিশারী, বন্দনা, Rousing call to Hindu Nation/ স্বামীজীর হিন্দুরাষ্ট্রচিন্তা/ সংঘপরিচিতি— ইত্যাদি থেকে গণবেশের বিভিন্ন অঙ্গ, ডাক্তারজীর গুরুজীর ফটো অবধি, থাকত স্বস্তিকা বা অর্গানাইজার। যাদের যেটা হয়ে যেত বংশীদা সেই ফাঁকা জায়গায় টিক দিয়ে দিতেন। প্রতিটি কার্যকর্তার বাড়ীতে কি ছিল তা খাতায় দেখে বলে দিতেন। প্রত্যেক স্বয়ংসেবকের বাড়ীতে ঢুকে দেখতেন ডাক্তারজীর গুরুজীর ফটো তাদের বাইরের ঘরে লাগানো আছে কিনা?

মাননীয় একনাথজী বিবেকানন্দ রচনাবলী পাঠ করে লিখলেন "Rousing call to Hindu Nation", বাংলায় অনুবাদ করে হলো 'স্বামীজীর হিন্দুরাষ্ট্রচিন্তা'। বংশীদার ব্যাগে বই থাকত। যে বাড়ীতে যেতেন বলতেন সোয়া দুটো টাকা দেন। বংশীদা টাকা চাইছেন— বাড়ীর লোকেরা দিয়ে দিতেন। বংশীদা তখন 'স্বামীজীর হিন্দুরাষ্ট্রচিন্তা' আর 'মহাভারতের পথের দিশারী' দুটো বই দিয়ে দিতেন।

'স্বস্তিকা' যাতে প্রতিটি বাড়ীতে যায় সেইজন্য তিনি গ্রাহক সংগ্রহ আভিযানে আমাদের সব কার্যকর্তাদের নামাতেন। শারদীয়া সংখ্যা দিয়ে গ্রাহক অভিযান শুরু হোত। কি অপূর্ব প্রয়াস ছিল এই স্বস্তিকাকে তুলে ধরার জন্য, আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। আদর্শবাদী মন ফাঁসির দড়িকে ভয় পায় না। বংশীদা জীবনকে সেইভাবে দেখাতে চেয়েছিলেন। তিনি জানতেন, "a genuine knowledge of social reality does not suffice if it is not supported by a strong moral sense."

বড়দের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল তাঁর। তাই তিনি নিজেও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। আমার জীবনের পরিধিতে মালদহে ক্ষুদ্র পরিমণ্ডলে বংশীদাকে নাম ধরে ডাকতেন— পূজনীয় গুরুজী, একনাথজী, আপ্তেজী, অমলদা ও অনন্তদা। বংশীদা অমলদাকে খুবই ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন। এই "Nepoleonic General"কে ধমকাতে পারতেন শুধু অমলদা। অমলদা মালদহে এলে বংশীদা নিজে ঘর গুছোতেন। বিছানা, মশারী পরিষ্কার করতেন। নিজে চাদর পাততেন। আমরা এইগুলো কাজ করতে চাইলে তিনি দিতেন না। বলতেন— আমার দাদা আসছেন— আমিই এইসব করব। বংশীদা গর্ব করে বলতেন—"আমি অমলদা'র হাতে মানুষ।" ১৯৬০'এ গৌড়ে 'ট্রিপ' হচ্ছে। অমলদাও এসেছেন। গৌড় ভ্রমণের জন্য আড়াই ঘণ্টা সময় বরাদ্দ করা হয়েছে। ফিরোজ মিনার'এ (যার পূর্ব নাম ছিল তুলসী মন্দির) ওঠা নিষিদ্ধ করেছেন বংশীদা। কারণ এতে সময় নষ্ট হয়ে যাবে। পরবর্তী কার্যক্রম বিঘ্নিত হবে। স্বয়ংসেবকদের মনে ক্ষোভ। আমি এই ক্ষোভের কথা অমলদাকে গিয়ে বললাম। অমলদা চলে এলেন। সোজা আদেশ দিলেন—"আমার ভাষণের প্রয়োজন নাই বংশী, তুই স্বয়ংসেবকদের উপর উঠতে দে। বড়দের দায়িত্ব দে যাতে কোন অসুবিধা না হয়।" বংশীদা মেনে নিলেন আদেশ। গৌড়ের ভ্রমণ সংক্ষিপ্ত করে অমলদার ভাষণও হয়েছিল।

বংশীদা'র অনুভবপ্রবণ মনে মাঝে মাঝে বিচিত্র বেদনা আসতো। ১৯৬৩-তে গুরুজী এলেন। বংশীদা বহু চেষ্টা করলেন একটা প্রাইভেট গাড়ী যোগাড় করতে। পারলেন না। শেষে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করলেন। মালদহ টাউন স্টেশনে সেদিন কোনও মন্ত্রী এসেছিলেন। ট্যাক্সি স্টেশন চত্বরে প্রবেশ করতে দিল না। গুরুজীকে আমরা নিয়ে এলাম। হেঁটে এলেন গুরুজী। যন্ত্রণাটা কিন্তু বংশীদার বুকে বিঁধল। বললেন— "তুষার, আজ একটা প্রাইভেটকার কারও কাছে পেলাম না— গুরুজী কতখানি হাঁটলেন— অথচ মন্ত্রীদের জন্য কত গাড়ী।"

ঠিক এই রকম এক ঘটনা ঘটল ১৯৬৮-তে। গুরুজী উঠেছেন বালুচরে বিশ্বনাথ নন্দীর বাড়ীতে। একটা কার এনে গুরুজীকে রেখে গেছে। সকালের আহার শেষ। দুপুরে পথ সঞ্চ লন। বিকালে সমাবেশ। কিছুদিন আগে নকুলদার বাবা মারা গেছেন (ডাঃ নিত্যগোপাল দাস)। গুরুজী এই বাড়ীতে উঠেছিলেন ১৯৬০ সালে। গুরুজী সংবাদটা পেলেন। আমি গুরুজীর কাছে আছি। গুরুজী বংশীদাকে বললেন, "বংশী, আমি একবার নকুলের বাড়ী যাব।" বংশীদা বললেন "গুরুজী, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি এসে নিয়ে যাচ্ছি।" বংশীদা আমাকে ডেকে বললেন, "তুই গুরুজীর কাছে থাক, আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে আসছি।" বংশীদার দেরী হচ্ছিল। গুরুজী আমাকে বললেন, "তুষার তুমি নকুলের বাড়ী চেন না?" আমি বললাম, "হ্যাঁ চিনি।" থাট্টেজী দাড়ি কাটছিলেন। গুরুজী আমাকে নিয়ে বের হয়ে পড়লেন। পুরাটুলী বাঁধ রোড হয়ে কুতুবপুর দিয়ে নকুলদার বাড়ী এলাম গুরুজী আর আমি। নকুলদা'র বাড়ীর সকলে গুরুজীকে দেখে প্রচণ্ড খুশী। গুরুজী গল্পগুজব করতে লাগলেন। এর মধ্যে বংশীদা একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে নিয়ে এলেন। বংশীদা আমাকে খুব ধমকালেন— তোর কাণ্ডজ্ঞান নাই। তুই গুরুজীকে এতটা পথ হাঁটিয়ে নিয়ে এলি। আমি নিশ্চুপ। গুরুজী বংশীদাকে ধমক দিলেন— "তোমার ট্যাক্সির জন্য আমি বসে থাকব?" বলেই গুরুজী প্রাণ খোলা হাসি হেসে উঠলেন।

বংশীদা পরে দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, "জানিস তুষার এখনও সমাজের সেই স্তরের লোকের কাছে আমরা পৌঁছাতে পারিনি যেখানে পূজনীয় গুরুজীর জন্য একটা প্রাইভেট-কার সবসময়ের জন্য পেতে পারি।" আজ যুগ পাল্টে গেছে। ভীষণভাবে পরিবর্তিত হয়েছে জীবনযাত্রা। কিন্তু বংশীদার এই অন্তর্বেদনার মূল্য অনেক। আত্মার আত্মীয় যাঁরা তাঁদের জন্য এতটুকু কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না। অথচ নিজে যখন প্রচারক হয়ে এলেন দুবেলা খেতেন "অন্নপূর্ণা হোটেলে।" পরে কোথা থেকে এক বিচিত্র টিফিন ক্যারিয়ার জোগাড় করলেন যার নীচে কয়লা ধরিয়ে রেখে দিতেন। আর এক একটা পাত্রে চাল ডাল আলুপটল। সব সেদ্ধ। লবণ মশলা সব এক সাথে। এক বিচিত্র খানা। এই 'মোগলাই' খানা খেয়েই শরীরকে চালিয়ে ছিলেন সেনাপতির মতো। আলবের কাম্যুর মতো বলতে ইচ্ছে করে, বংশীদা এক বিশাল প্রস্তর খণ্ডকে পর্বতের নীচ থেকে শীর্ষদেশে তুলবার চেষ্টা করছেন— প্রস্তরখণ্ড তাঁর স্বয়ংসেবক আর পর্বতচূড়া তার আদর্শবাদের অভীষ্ট লক্ষ্য স্থান।

কলকাতা মহানগরের একদা চার প্রচারক— (বাঁ দিক থেকে) কেশব দীক্ষিত, রথীন চক্র(বর্তী, রতন ভট্টাচার্য ও বংশীলাল সোনী। (ফাইল চিত্র)

স্বয়ংসেবকদের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে বংশীদার সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। তখনকার স্বয়ংসেবকেরা প্রায় সবাই ছিলেন নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের। অনেকে দরিদ্র পরিবারের। শীতকালীন শিবিরের শুল্ক ধার্য হতো বিচিত্র 'combination'-এ। দেড় টাকা শুল্ক— দু'সের বা তিন সের চাল। এক পোয়া ডাল। জমির আলু থাকলে তাও সমপরিমাণ মূল্যের দিয়ে শিবিরে যোগ দেওয়া যেত। এইসব পরিবার থেকে তিনি কার্যকর্তা বের করে নিয়ে এসেছিলেন। তাদের উচ্চ শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করেছিলেন। শেষে বিভিন্ন স্কুলে তিনি কার্যকর্তাদের শিক্ষক রূপে নিয়োগের সাহায্য করেছিলেন। জেলার বহু কৃতী প্রধান শিক্ষকদের সঙ্ঘের দায়িত্বে এনেছিলেন— শহরের প্রমথ প্রসন্ন সেনগুপ্ত থেকে কলিগ্রামের যোগেন্দ্রমোহন মণ্ডল, আইহো গ্রামের বৃন্দাবনদাস ঘোষ থেকে ওল্ড মালদার সুধীর কুমার সাহা। রায়গ্রামের শুভেন্দুমোহন বক্সী থেকে রেবতীমোহন ঝা— সকলেই বংশীদার গুণমুগ্ধ ছিলেন। বিভিন্ন স্কুলে স্বয়ংসেবকদের চাকুরীতে নিয়োগ করার অপূর্ব ক্ষমতা তাঁর ছিল। তিনি জানতেন এই শিক্ষকেরা সঙ্ঘের কাজের বনিয়াদ তৈরি করবেন। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন স্থানের স্বয়ংসেবকদের তিনি মালদহে এনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাঁকুড়ার মোহন চ্যাটার্জি, কাটোয়ার সিতাংশু ব্যানার্জি, কালনার অশোকচাঁদ বর্মন, এমনকি বীরভূম থেকে সত্যনারায়ণ মজুমদারকে (বর্তমানে ক্ষেত্র কার্যবাহ) বংশীদা মালদহে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বংশীদা বিশ্বাস করতেন— এমন একটা দিন আসবে যখন মানুষ রক্তের সম্পর্ক ছাড়াই আত্মার আত্মীয়তা অনুভব করবে।

একজন প্রচারক দুর্যোগে মানুষের পাশে কিভাবে দাঁড়াতে পারেন তা বংশীদা দেখিয়ে ছিলেন। উত্তরবঙ্গ চিরকালই বন্যাগ্রস্ত। আজও বন্যা হয়, মানুষ ডোবে, মানুষ মরে। সমাজ এখন আর প্রায়ই পাশে দাঁড়ায় না। সেবা বা সাহায্য করা এখন সরকারের কাজ। বংশীদা গঠন করেছিলেন উত্তরবঙ্গ সেবা সমিতি। গঠন করেছিলেন উত্তরবঙ্গ সেবা যোজনা। দুটো প্রতিষ্ঠানের সংগঠন সম্পাদক ছিলাম আমি। বংশীদাকে দেখেছি কিভাবে সেবাকার্যকে ত্বরান্বিত করতেন। ১৯৬৮'র জলপাইগুড়ির ভয়ঙ্কর বন্যায় বংশীদা হাজির। একটা জেলা কিভাবে জলের তলায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বর্তমান প্রজন্ম ধারণা করতে পারবে না। আমরা প্রায় এক মাস যাবৎ সেবাকাজ চালিয়ে ছিলাম। পুজনীয় গুরুজীর আহ্বানে অজস্র সাহায্য এসেছিল। নিরন্ন মানুষের মুখে যেভাবে তুলে দেওয়া হয়েছিল ত্রাণসামগ্রী, তাতেও বংশীদার উদ্ভাবনীশক্তি ছিল। চিড়ে, মুড়ি, পাউরুটি, রুটি, জামাকাপড়, ওষুধ তো ছিলই। দুদিন পর বংশীদা প্রস্তাব রাখলেন চিনি, চা, বিস্কুট, চানাচুর, গুঁড়ো দুধ বিভিন্ন এলাকার দেওয়ার। সবাই খুশী। তখন ক্যারিব্যাগ ছিল না। আমরা কাগজের প্যাকেটে নিয়ে এইসব বাড়ী বাড়ী দিতাম। সকল বাড়ী থেকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ পেয়েছিলাম।

একদিন বংশীদার নির্দেশে এক ট্রাক ত্রাণসামগ্রী নিয়ে মণ্ডলঘাট রওনা দিলাম। সাত আট জন স্বয়ংসেবক ছিল। সামনে পড়ল করলা নদী। তার ব্রীজ উড়ে গিয়েছিল বন্যায়। আমরা ত্রাণ নিয়ে যাচ্ছি বলে সামরিক বাহিনীর লোকেরা দেড় ঘণ্টার মধ্যে বেইলি ব্রীজ বানিয়ে দিলেন। এদিকে বংশীদা খবর পেয়েছেন করলার সেতু নাই। আমাদের কি হলো দেখবার জন্য মিলিটারীদের গাড়ী চড়ে চলে এলেন। বংশীদা আমাদের ঐরকম দুর্গম স্থানে পাঠিয়ে স্বস্তি পাননি। তাই চলে এসেছিলেন। আমরা মণ্ডলঘাটে প্রথম ত্রাণ নিয়ে ঢুকি। আমাদের ত্রাণ মুহূর্তেই লুঠ হয়ে গেল। ওখানকার মানুষকে বোঝালাম এ ত্রাণ সরকারী নয়— এ ত্রাণ এনেছি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে। রাতে ফিরে এসে বংশীদাকে মণ্ডলঘাট ও দোমোহনীর অবর্ণনীয় দুঃখের কথা বললাম। বংশীদা আমাকে নিয়ে জলপাইগুড়ির ডিভিশনাল কমিশনারের সাথে দেখা করলেন। ওখানেই স্থির হলো বংশীদা তিন ট্রাক ত্রাণসামগ্রী নিয়ে যাবেন। সরকারী ত্রাণসামগ্রী যাবে চার ট্রাক। ট্রাকের ব্যবস্থা কমিশনার করেছিলেন। সাথে পুলিশ ছিল। বংশীদার নেতৃত্বে ত্রাণসামগ্রী চলল মণ্ডলঘাট। আজ মণ্ডলঘাটের মানুষ এসব খবর জানে কিনা তা জানি না।

১৯৭১-এ ভারতের পরিস্থিতি পাল্টাতে লাগল। শুরু হলো ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ। যার আরেক নাম বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। মালদহে নামতে লাগল সামরিক বাহিনী। হিলি বর্ডার দিয়ে আক্রমণ করতে লাগল ভারতীয় সৈন্য। সৈন্যবাহিনীকে চবিবশ ঘণ্টা পরিষেবা দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করল জেলা প্রশাসন। জেলাশাসক স্বয়ম্ভু প্রসাদ দে— তিনি বংশীদার হাতে তুলে দেন এই সেবার ভার। মঙ্গলবাড়ীতে ৩৪নং জাতীয় সড়কের পাশে তাঁবু পড়ল। প্রতিটি সৈনিকের জন্য স্বল্পাহারের ব্যবস্থা হলো। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। বৈজয়ন্ত ট্যাঙ্ক রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে সার সার। আমরা তাঁদের স্বল্পাহার পরিবেশন করছি। আর মেয়েরা মালা গেঁথে জওয়ানদের গলায় দিচ্ছে, কপালে দিচ্ছে চন্দনের টিপ— "মেরা ভাইয়া জরুর লৌটেগি—জিতকর লৌটেগি।" মনে হলো "সৈনিক অভ্যর্থনা কেন্দ্রের আমরা সবাই সামরিক বাহিনীর সাথে একই পরিবার।" এই কেন্দ্র চলেছিল একুশদিন। ১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় সৈন্য বিজয়ী হলো। এই সৈন্যরা ফিরতি পথে বন্দী করে নিয়ে এসেছিল খান সৈন্যদের। সমগ্র শহর জুড়ে উত্তেজনা। ১ জানুয়ারী, ১৯৭২ অবধি চলেছিল এই কেন্দ্র। অজস্র খাবার বেঁচেছিল। সেই সামগ্রী বাংলাদেশে দেওয়ার পরিকল্পনা হলো। ২ জানুয়ারী বংশীদা ও জেলা পরিষদের এক্সিকিউটিভ অফিসার হরিগোপাল চ্যাটার্জির সাথে আমিও গেলাম রাজশাহী অবধি। বাংলাদেশকে বধ্যভূমি বলে মনে হলো। পথ বন্ধ সব মাইন পাতা। ত্রাণ সামগ্রী বিভিন্ন শিবিরে দিয়ে যখন ফিরছি, বিধ্বস্ত গ্রামগুলো দেখে শিউরে উঠেছিলাম আমরা। বংশীদা স্থির করলেন বাংলাদেশে বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির পক্ষ থেকে ত্রাণের কেন্দ্র গড়তে হবে। ফিরে এসে কলকাতায় ছুটলেন। সবাইকে রাজী করালেন। ভারত সরকারের পক্ষ হতে যেসব প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে ত্রাণ সামগ্রী দেবে তাতে বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির নাম নথিভুক্ত করলেন। ঠিক হলো একটা কেন্দ্র হবে ঢাকায় অপরটি হবে রাজশাহীতে। রাজশাহীতে চাপাইল, নবাবগঞ্জ, শিবাগঞ্জ, বারঘরিয়া, লাহারপুর, হরিনগর প্রভৃতি গ্রামকে বাছা হলো। মঙ্গলবাড়ীতে শুরু হলো তাঁত তৈরী করা। দু'ধরনের তাঁত— ঠকঠকি আর চিত্তরঞ্জন। এর সাথে ঢেঁকি, মাছ ধরার জাল ও স্বর্ণকারদের সামগ্রী প্রভৃতি সংগ্রহ হলো। ঠিক হলো ২৩ জুন (১৯৭২) ঢাকায় ত্রাণমন্ত্রী মহঃ কামারুজ্জামানের হাতে এইসব সামগ্রী তুলে দেবেন মাস্টারমশায় (কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী) সাথে নরেশদা (নরেশচন্দ্র

(এরপর ১৫ পাতায়)

বৌদ্ধিক সন্ত্রাস

শারীরিক সন্ত্রাস যেমন মানুষকে শারীরিকভাবে পঙ্গু করে এমনকী মৃত্যু পর্যন্ত ঘটায়, তেমনি বৌদ্ধিক সন্ত্রাসবাদীরাও মানুষের বুদ্ধিকে পঙ্গু করে দেয়, চেতনা শক্তিকে শেষ করে দেয়। হিন্দু সমাজের উপর এই বৌদ্ধিক সন্ত্রাস দীর্ঘদিন ধরে চলছে। এর ফলে হিন্দু সমাজের একটা অংশের মধ্যে সঠিকভাবে চিন্তাভাবনা করার ক্ষমতার অবলুপ্তি ঘটেছে।

মধ্যযুগীয় সুলতানী ভারতে সুফী আন্দোলনের মাধ্যমে এই সন্ত্রাসের সূচনা আজ যা চরম আকার নিয়েছে। বর্তমানে একদল সাংবাদিক, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক ও অন্যান্য পেশার কিছু লোক এই ভূমিকাটা পালন করে যাচ্ছে।

প্রথম উদাহরণ হিসাবে সেইসব বৌদ্ধিক সন্ত্রাসে বিশ্বাসী ঐতিহাসিকদের কথা বলা যেতে পারে, যারা বলেন চরমপন্থী ও বিপ্লবীরা হিন্দুধর্মের নানা আচার অনুষ্ঠান, উৎসব প্রভৃতি পালন করায়, প্রকাশ্যে গঙ্গা ও গীতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করায় মুসলমানরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে কোনও পাশবিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে হিন্দুরা আধ্যাত্মিক শক্তির আশ্রয় নিয়েছে অতি প্রাচীনকাল থেকেই। তাই বিপ্লবীরা আধ্যাত্মচেতনার আশ্রয় নিয়ে অন্যায় কিছু করেননি। মুসলমানরা যদি সত্যিই দেশমাতাকে ভালবাসত তবে তারা বিপ্লবী সংগঠনে যোগ দিত। সেখানে তারা দিনে দশবার কোরান পাঠ করত ও পাঁচবার নামাজ পড়ত।

মনে পড়ছে আর একটি দিনের কথা, দিনটা ছিল ১৯৯৮ সালের ৬ আগস্ট। তখন বাজপেয়ী সরকার কেন্দ্রে, ক্ষমতায় এসে জাতীয় স্বার্থে পোখরানে পরমাণু বোমা পরীক্ষা করেছিল। সেদিন টিভিতে দেখি বুদ্ধিজীবীরা ও সিপিএম মিছিল বার করেছে হিরোসিমা দিবস উপলক্ষে। এই মিছিলের শেষে বক্তারা বাজপেয়ী সরকারকে তুলোধনা করছে। দেখেশুনে মনে হয়েছিল বাজপেয়ী সরকার বুঝি হিরোসিমায় পরমাণু বোমাটি ফেলে দিয়ে এসেছিল!

ভারত ভাগ হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে। মুসলমানরা নিজেদের হিস্যা পাকিস্তান, বাংলাদেশ বুঝে নিয়েছে। তারপরেও ভারতে জামাই আদরে রয়েছে। অন্যদিকে হিন্দুরা পাকিস্তান, বাংলাদেশ থেকে শুধু বিতাড়িতই হয়নি, এই স্বাধীন ভারতে নিরবচ্ছিন্নভাবে সংগঠিত মুসলিম আক্রমণের শিকার হয়েছে। কাশ্মীরি পণ্ডিতরা স্বাধীন ভারতেও উদ্বাস্তু। এই পশ্চিমবঙ্গে গুসকরা, কাটোয়া, বেলডাঙার মতো অজস্র জায়গায় হিন্দুদের ওপর সংঘটিত আক্রমণের ঘটনার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু হিন্দুদের উপর আক্রমণ হলে তার বিরুদ্ধে কোনও ধরনের প্রতিবাদই করা যাবে না। প্রতিবাদ করলেই এই বৌদ্ধিক সন্ত্রাসবাদীরা হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক বলে চিহ্নিত করছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মিটিং-মিছিল হরতাল কোনও কিছুই করা যাবে না। হিন্দুদের জন্য গণতন্ত্র নয়। সমস্ত গণতান্ত্রিক অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি শুধু মুসলমানদের জন্য। তাই দেখি, কারণ আবিষ্কার করে যৌক্তিকতা বিচার না করেই প্রজ্ঞা সিংকে গ্রেপ্তার করা হয়, জেলের ভিতর অমানবিক অত্যাচার করা হয়। অন্যদিকে গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত মাদানীকে গ্রেপ্তার করার জন্য হাইকোর্টকে নির্দেশ দিতে হয়। নির্দেশে পাওয়ার পরও গ্রেপ্তার করতে পুলিশের দিনের পর দিন কেটে যায়।

এই রকম অজস্র উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। আমরা হিন্দুরা হলাম স্থিতপ্রজ্ঞ। দৃশ্যমান স্থূল জগৎ ছাড়িয়ে আমরা সমস্ত মানবজাতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু তাই বলে গোটা হিন্দু সমাজ এমন কাপুরুষ বা চৈতন্য সমাধিপ্রাপ্ত হয়নি যে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য প্রতিরোধ করবে না। আর যখন প্রতিরোধ করি, তখন এই মৌলবাদী মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিরাই হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক বলে গালিগালাজ করে।

—রাজকুমার পাল, সাগরভাঙ্গা, দুর্গাপুর।

হজ হাউস

ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ভারতীয় সংবিধানের এই দৃষ্টিকোণকে উপেক্ষা করে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করতে নানারকম সংবিধান বিরোধী কাজ করে চলছে বলে বিভিন্ন মহলে বিতর্ক শুরু হয়েছে। ২৯শে আগস্ট রাজারহাটের কৈখালিতে ভি আই পি রোডের ধারে একটি হজ হাউসের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। এটি শহরের দ্বিতীয় হজ হাউস। ৫০ হাজার বর্গফুটের সাততলা এই হজ হাউস তৈরি করতে সরকার খরচ করেছে ১০ কোটি টাকা। অথচ অন্য কোনও ধর্মের মানুষের জন্য সরকার কিছুই করেনি। বিতর্ক শুধু এ নিয়েই নয়। এই অনুষ্ঠানে জাতীয় হজ কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান আবু বক্কর সাহেব নিজেকে অরাজনৈতিক ব্যক্তি বলে দাবি করেন। তারপরই তিনি বলেন, যে পার্টি ইসলামের ভালোর জন্য কাজ করবে, তাদেরই ক্ষমতায় আসা উচিত। ভারতবর্ষকে মুসলিম রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার জন্য কায়েদ-এ আজম মহম্মদ আলি জিন্না-র মানসিকতার প্রতিফলিত নাস্তিক কমিউনিস্ট নেতা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ভাষণেও। তিনি মুসলিম ভোটারদের তুষ্ট করতে প্রকাশ করলেন তাঁর নবতম সংযোজন মুসলিমদের ওবিসি ভুক্ত করা! মন্ত্রিসভায় বিষয়টি পাস না হতেই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন মোট ১ কোটি ৪০ লক্ষ মুসলিম ওবিসি সার্টিফিকেট পারেন। এ ছাড়া সারা রাজ্যে ১২টি ইংরেজি মাধ্যমে মাদ্রাসা চালু হবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আমরা ৬০০টি মাদ্রাসা চলাই। আরও ৩০০টি মাদ্রাসা হাতে নেব। মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের বেতন আমরাই দিই। দেশের কোথাও এই ব্যবস্থা নেই।

হজ হাউস উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সাত্তার বলেন—পূর্ত দপ্তরের তৈরি এই বাড়িটিতে বছরের তিন মাস হজ যাত্রীদের থাকার জন্য ব্যবস্থা করা হবে। বাকি নয় মাস এখানে মুসলিম সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এখানে মোট ৩৭ রকম প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। হজ যাত্রার ব্যয় বহন এবং হজ যাত্রীদের জন্য সরকারী টাকায় যে দেশে এমন পরিষেবার আয়োজন হয়, সে দেশে কিভাবে গঙ্গাসাগর মেলার যাত্রীদের কাছ থেকে তীর্থকর আদায় করা হয়—এ প্রশ্ন বুদ্ধদেববাবুর মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক উৎসব আয়োজন দেখে আবার হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে দানা বেধে

উঠেছে। অনেকের মুখেই শোনা গেলো, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের আর কোনও অমুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের ভোটের দরকার নাই। বিশেষ করে যেখানে হজ হাউস উদ্বোধন একটি সরকারি অনুষ্ঠান, ঘোষণার পরেও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে অনুষ্ঠান শুরু করা হয় ইসলাম ধর্মগ্রন্থ পাঠের মধ্য দিয়ে। অনুষ্ঠান শেষ হলো "খোদা হাফিস" জানিয়ে। মাঝে মাঝে নাস্তিক কমিউনিস্ট বুদ্ধদেববাবুর মুখেও শোনা গেলো "সেলাম আলেকুম"। তিনি ঘোষণা করলেন মুসলিম ধর্ম শিক্ষায় ঢালাও ছাড়ের কথা। বস্তুত মুসলিম মন জয়ের কোনও চেষ্টাই বাকি রাখেননি আমাদের মাননীয় ধর্মনিরপেক্ষ মুখ্যমন্ত্রী!

হজ ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী-র আচরণে এবং বক্তব্যে মুসলিম মহলেও নানারকম প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষ করে ১ কোটি ৪০ লক্ষ মুসলিমকে ওবিসি পরিচয় পত্র দেওয়া নিয়ে। কারণ মুসলিমরা ভাষা দেশ বা অন্য কিছু নিয়ে বিভাজন তাদের ধর্ম বিরুদ্ধ কাজ বলেই মনে করে। সারা পৃথিবীতে তাদের একটাই পরিচয়, তারা মুসলমান। এছাড়া সোভিয়েত রাশিয়ায় কমিউনিস্টরা মসজিদ গীর্জা প্রভৃতি উপাসনা গৃহের কি হাল করেছিল তা মুসলমানরা কোনওদিন ভুলতে পারবে না। কাজেই বুদ্ধদেববাবুর মতো একজন কাফেরের মুসলীম প্রেমের মাঝে তারা কোনও আন্তরিকতার চিহ্ন মাত্র খুঁজে পাচ্ছেন না। এর সত্যতা প্রমাণ করতে হলে তাকে ইসলাম ধর্মগ্রহণ করে পাঁচবার নমাজ পড়ে 'পাপমুক্ত' হতে হবে। এমনই নানারকম বক্তব্যে বুদ্ধদেববাবু মুসলিম মহলে এখন একটি পরিহাসের পাত্র রূপে চিহ্নিত হয়েছে। মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য সরকার যেসব কাজ করেছে তার কৃতিত্ব অর্জন করছেন মুসলিম বিধায়ক এবং মন্ত্রীগণ।

—শ্যামাপ্রদাস দাস, অশোক নগর, উত্তর ২৪ পরগণা।

রাজনৈতিক দলের আয়

অতি সম্প্রতি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলগুলির আয়ের এক হিসাব পেশ হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে বেশী আয় কংগ্রেস দলের, তাদের ৪৯৭ কোটি টাকার অর্ধেকও আয় করতে পারেনি প্রধান বিরোধী দল বিজেপি (২২০ কোটি টাকা)। প্রত্যেক দলের সংগৃহীত অর্থের সিংহভাগই আসে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে। অর্থাৎ কংগ্রেসের এই টাকা মূলত ব্যবসায়ীদের টাকা। কেউই কোনও দলের পিছনে বৃথা অর্থ ব্যয় করবে না তা একটি দুধের শিশুও বোঝে। অর্থাৎ কংগ্রেসের পিছনে টাকা ঢালায় ব্যবসায়ীদেরও যে স্বার্থ থাকবে সেটাই স্বাভাবিক।

প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে যেভাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে চলেছে এবং কংগ্রেস সরকার যেভাবে হাতগুটিয়ে বসে রয়েছে তাতে বোঝাই যায় যে, সমস্ত ব্যবসায়ী কংগ্রেসকে এই টাকা পার্টিফাণ্ডে দিয়েছে। তাদেরকে কালোবাজারীর সুযোগ করে দিয়ে কংগ্রেস বর্তমানে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে চলেছে। অর্থাৎ 'আম-আদমী কা সরকার' বর্তমানে ব্যবসায়ীদের দলে পরিণত হয়ে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের সদাজাগ্রত 'মিডিয়া' এ ব্যাপারে নিশ্চুপ!

—রাজু হালদার, হালাড়া, বর্ধমান।

মাওবাদী সমস্যা

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে মাওবাদী সমস্যা ক্রমশই জটিল থেকে জটিলতর আকার ধারণ করছে। মাওবাদীদের হিংসাশ্রয়ী রাজনীতিতে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা অবনতির একটা অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তবে রাজ্যপ্রশাসনে সক্রিয়তার অভাবে মাওবাদীদের বিচরণক্ষেত্র ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে তা বলা যায়। আর মাওবাদীদের নাশকতা চালানোর অন্যতম লক্ষ্যই হলো রেল। রেল কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন হলেও রাজ্য সরকার এর দায় এড়াতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন হলো, হঠাৎ মাওবাদীদের উত্থান হলো কোথা থেকে? এর পেছনে কাদের হাত রয়েছে? কেনই বা হিংসাশ্রয়ী ও ধ্বংসাত্মক আন্দোলনের পথে মাওবাদীরা? একথা ঠিক যে জন্মলগ্ন থেকে কেউ মাওবাদী হয় না। পরিবেশ ও পরিস্থিতিই মাওবাদী তৈরি করে। দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চনা, অবহেলা, শোষণের শিকার হওয়া সুবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন। ফলে আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিতে তাঁরা বাধ্য হন। জঙ্গলমহলের মানুষ নিপীড়িত, অবজ্ঞার শিকার হয়ে অসহায়তা, দারিদ্র্য ও চরম দুর্দশার মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করেছেন। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সেখানে বৈষম্য প্রকট হয়ে ওঠে। উপায়ান্তর না দেখে সেই অবহেলিত মানুষেরা নিষ্ঠুর ও নৃশংস হয়ে ওঠে। রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের পথে অগ্রসর হয়। তাই ধৈর্য্য ও সহ্যের সীমা লঙ্ঘন করে তাদের মাওবাদীরূপে আত্মপ্রকাশ। এরা বিক্ষুব্ধ কমিউনিস্টদের একটা অংশ বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাই মাওবাদী সৃষ্টির মূলে পরোক্ষে কমিউনিস্টদেরই দায়ী করা যায়।

এখন রাজ্যে মাওবাদীদের ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসে মানুষ আতঙ্কিত, ভীতসন্ত্রস্ত। কিন্তু মাওদমনের উপায় কি? কোটি কোটি টাকা খরচ করে যৌথবাহিনীর সহযোগিতায় কি এ সমস্যার সমাধান আদৌ সম্ভব? আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ পরোক্ষে রক্তক্ষয়ী সন্ত্রাসকেই মদত দেয় না কি? এছাড়াও হার্মাদবাহিনীর মাধ্যমে জঙ্গলমহলে জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম করার প্রচেষ্টাই মাওবাদী ক্রিয়াকলাপকে ত্বরান্বিত করে বলা কি অন্যায়? এর ফলেই তো মাওবাদীদের বাড়বাড়ন্ত বেড়ে চলেছে। তারা ক্রমশ বিদ্রোহী হয়ে পড়ছে। তাই আক্রমণ নয়, আলোচনার মাধ্যমেই সমাধান সম্ভব। আর দ্বিচারিতা নয়, সকলের জন্য উন্নয়নের মধ্য দিয়েই শৃঙ্খলা ফেরাবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। মাওবাদীদের সমাজজীবনের মূল স্রোতে ফেরাবার এটাই অন্যতম পন্থা। অন্যথায় মাওসমস্যা আরও তীব্র হলেও বলার কিছু থাকবে না।

—সমীর কুমার দাস, দ্বারহাট্টা, হুগলী।

অসতর্ক ভাষান্তরণ

পণ্ডিত নেহরুর একটি বিখ্যাত উক্তি, "By accident I am a Hindu, culturally I am a Muslim and in education I am an English" স্মরণ করে 'নিজস্ব প্রতিনিধি' কথাটির ভাষান্তর করে লিখেছেন— নেহেরু এককালে বলেছিলেন যে, তিনি জন্মসূত্রে ভারতীয় হতে পারেন, কিন্তু সংস্কৃতিগতভাবে ইসলামপন্থী এবং কথা বলার ক্ষেত্রে বৃটিশদের ইংরেজি ভাষাতেই সবচেয়ে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন—(স্বস্তিকা, ১২.৭.১০; পৃঃ ১৩)।

বলাবাহুল্য, তর্জমাটি যথাযথ হয়নি। ফলে, পণ্ডিতজীর বক্তব্য সঠিকভাবে পরিস্ফুট হয়নি।

—বিমলেন্দু ঘোষ, পর্ণশ্রী, কলকাতা।

জাতকে অদ্ভুত রামায়ণ

নির্মল কর

সীতা রামের বোন, দশরথের মেয়ে— একথা শুনলে অনেকে চোখ কপালে তুলবেন। কিন্তু বৌদ্ধ জাতক-গ্রন্থের 'দশরথজাতক'-এ এমনটাই উল্লিখিত হয়েছে। এই জাতকে যে 'অদ্ভুত রামায়ণ' রয়েছে তা সংক্ষেপে এইরকম—

অতীতে বারাণসীতে ছিলেন মহারাজ দশরথ। তাঁর ষোল হাজার রাণীর মধ্যে অগ্রমহিষী বা পাটরাণী দুই পুত্রসন্তান ও এক কন্যার জন্ম দেন। বড় ছেলের নাম রামপণ্ডিত, ছোট ছেলের নাম লক্ষ্মণকুমার আর মেয়ের নাম সীতাদেবী (জেঠ্ঠপুত্তো রামপণ্ডিতো নাম অহোসি, দুতিয়ো লকখনকুমারো নাম, ধীতা সীতাদেবী নাম)। পাটরাণী মারা গেলে মহারাজ আরেক স্ত্রীকে পাটরাণী করলেন। তিনি ভরতকুমার নামে এক পুত্রের জন্ম দেন। পরে এই পুত্রকে রাজা করতে চাইলে দশরথ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। তাঁর আশঙ্কা হলো নতুন পাটরাণী সতীনপুত্রদের বধও করতে পারেন। রাজা দৈবজ্ঞদের কাছে শুনলেন, তাঁর পরমায়ু আছে আরও বারো বছর। রামলক্ষ্মণকে ডেকে বললেন, এখানে তোমাদের সমূহ বিপদ। তোমরা সামন্ত রাজ্যে বা অরণ্যে চলে যাও। আমার মৃত্যুর পর ফিরে এসে এই রাজ্য গ্রহণ কর। ছেলেরা বললেন, তাই হোক। সীতা বললেন, আমিও ভাইদের সঙ্গে যাব— "অহমিপ ভাতিকেহি সদ্ধিং গমিস্যামি'।" ওরা তিনজন হিমালয়ে বসবাস করতে লাগলেন।

নবমবর্ষে দশরথের মৃত্যু হলে ভরত-মাতা চাইলেন ভরত রাজা হোক্। কিন্তু অমাত্যেরা রাজি হলেন না। ভরত রামকে রাজা করার জন্য বনে গেলেন রামকে ফিরিয়ে আনতে। পিতৃ-বিয়োগের কথা শুনে রাম শোক করলেন না, রাজ্যেও ফিরলেন না। শোকাকুল লক্ষ্মণ ও সীতাকে রাম সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে দীর্ঘ উপদেশ দিয়ে ভরতকে বললেন, লক্ষ্মণ ও সীতাকে নিয়ে ফিরে যাও, তাদের সঙ্গে রাজ্য চালাও। প্রজা পালন কর।' কিন্তু ভরত সেকথা শুনতে চাইলেন না।

রাম বললেন, পিতার আদেশ ছিল বারো বছর বাদে রাজ্যগ্রহণ করা। তার আগে ফিরলে পিতৃ-আদেশ লঙঘন করা হবে। আমার ফিরতে আরও তিন বছর বাকি। অগত্যা ভরত রামের পাদুকা নিয়ে রাজ্য-শাসন করতে লাগলেন। তিন বছর পর রাম লক্ষণ ও সীতা বারাণসীতে ফিরে এলেন। সীতা অগ্রমহিষী হলেন। রামসীতার অভিষেক হলো। রাম ষোল হাজার বছর যথাধর্ম রাজ্য পরিচালনা করে ইহলোক ত্যাগ করেন।

এই কাহিনী থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, জাতকের রামকথার সঙ্গে বাল্মীকির

রামায়ণের বহু গরমিল রয়েছে। দশরথ বারাণসীর নৃপতি, অযোধ্যার নয়। অবশ্য আদিতে অযোধ্যা ছিল কোশল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, আর কাশী কোশল ছিল একই রাজ্য। এর তবু একটা মানে হয়। কিন্তু রামায়ণের মূল পাত্র-পাত্রীদের পারস্পরিক সম্পর্ক জাতকে অন্যভাবে দেখানো হয়েছে, এমনকী ভগ্নীকে অগ্রমহিষী করা হয়েছে। জাতকে পিতৃ-সত্যের কথা নেই। পিতা ষড়যন্ত্রের আশঙ্কায় পুত্রকন্যাদের বনে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে বলেন। তাঁরা দক্ষিণ দিকে গেলেন না, গেলেন উত্তরে হিমালয় পর্বতে। বনবাসও বারো বছরের জন্য। এই জাতকে রাম-রাবণের যুদ্ধের উল্লেখ নেই। নেই প্রজানুরঞ্জনের জন্য সীতার বনবাসের কথা।

জয়দ্দিষ (৫১৩) জাতকের একটি গাথায় রামের দণ্ডকবনে বনবাস এবং যক্ষের (রাক্ষসের) সঙ্গে বিরোধের উল্লেখ পাওয়া যায়। জাতক কাহিনীকার ঈশানচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন, '...রামায়ণ ও মহাভারত যে জাতক রচনাকালে, এমনকী বুদ্ধদেবের সময়েও প্রচলিত ছিল, জাতকের নানা অংশে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের নামোল্লেখে তাহা স্পষ্ট বোঝা যায়। জাতকের প্রাচীন গাথাগুলির সঙ্গেও এই গ্রন্থদ্বয়ের কুত্রাপি কোন বিরোধ নাই। কিন্তু সাংস্কৃতভাষানভিজ্ঞ সিংহলী ভিক্ষুরা গদ্যাংশে স্বকপোল কল্পিত উপাখ্যান রচনা করিয়া ওই সকল চরিত্রের বিকৃতি ঘটাইয়াছেন' (৫ম খণ্ড পৃঃ ১৭)। আসলে, লোক-পরম্পরায় পৌরাণিক বীরকথা অবলম্বনে মহাকাব্য ও পুরাণ রচিত হয়েছিল। মহাকবির লেখনীতে লৌকিক কথা মহত্তর রূপারোপে চিত্রিত হয়েছিল। কিন্তু অন্য লেখকদের রচনায় সেইরূপ ধরা পড়েনি। হোমারের মহাকাব্য দু'টিরও ভিত্তি ছিল প্রাচীন লোককথা, যা মহাকবির কল্পনার তুলিকায় মহানরূপ ধারণ করে। তাছাড়া লোকমুখে প্রচলিত কাহিনী বিকৃত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এদিক থেকে জাকতকারকে দোষ দেওয়া যায় না। তিনি রামপণ্ডিতকে মোটেই ছোট করতে চাননি। রামপণ্ডিত পিতার আদেশকে শিরোধার্য করে বারো বছরই বনে কাটালেন। ভরত রামের পাদুকা দিয়ে রাজ্য চালনা করলেন। এমনকী ভগবান বুদ্ধও বললেন, গত জন্মে তিনিই ছিলেন রামপণ্ডিত। জয়দেবের দশাবতার স্তোত্রের বহুপর্বে রাম ও বুদ্ধ একাত্ম হয়ে যান বৌদ্ধ জাতকে। বাল্মীকি রামায়ণের আরও কিছু কাহিনী বিভিন্ন জাতকে ছড়িয়ে আছে। যেমন—ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনী আছে অলম্বুষা-জাতকে। দণ্ডকীরাজার কথা আছে শারভঙ্গ-জাতকে। শ্যাম জাতকে আছে বারাণসী-রাজ পিলিযক্ষ এক অন্ধ দম্পতির পুত্রকে বাণবিদ্ধ করেছিল। এর সঙ্গে দশরথ কর্তৃক অন্ধকমুনির পুত্র-বধের কিছুটা মিল আছে। অবশ্য এসব কাহিনীকে রামের জীবন-কাহিনীর সঙ্গে এক সূত্রে গাঁথা হয়নি, হয়েছে বুদ্ধের গত জন্মের সঙ্গে। কাহিনীগুলিতে কিছু পার্থক্যও লক্ষ্য করা যায়।

মনে করা হয়, রামায়ণ ও জাতক উভয়েই প্রচলিত লোককথা থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছিল। লোকমুখে প্রচলিত কথা মুখে মুখে তার বিকৃতি হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। তাই মনে হয়, 'অদ্ভুত রামায়ণ'-এর জন্য জাতক কাহিনীকারদের দোষী করা যায় না।

বৌদ্ধ জাতক ও বাল্মীকি রামায়ণের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে দেশি-বিদেশী পণ্ডিতমহলে বিতর্কের অন্ত নেই। জার্মান পণ্ডিত ভেবর মনে করেন, দশরথ জাতকে বৌদ্ধ ধর্মের মানসিক ক্ষমতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। আর পরে তার ওপর ভিত্তি করেই বাল্মীকি তাঁর মহাকাব্য রচনা করেন। ইংরেজ পণ্ডিত কীথ সাহেবের মত বিপরীত। তাঁর মতে বৌদ্ধ কাহিনীটি কখনই রামায়ণের প্রাচীন রূপ বা উৎস হতে পারে না, বরং জাতকই রামের গল্পকে একটি সদুদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছে। আবার জেকব সাহেব বলেন, রামায়ণ থেকেই পালিগাথাটি বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছে। অনেকে এইমত স্বীকার করেন না। লর্ডস সাহেব বলেন, প্রথমে ছিল একটি প্রাকৃত মূল, যা থেকে সব পুরানো গাথা বা শ্লোক লেখা হয়। ভিন্টারনিৎসের মতে, প্রথমে ছিল রামকে নিয়ে লোকগীতি বা ব্যালাড, বাল্মীকি তাকেই কাজে লাগান মহাকাব্য রচনায়। আর সেই গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব রয়েছে। এছাড়া কাব্যগাথাই হলো দশরথ জাতকের মূল আর গদ্যাংশ হলো পরবর্তী ভাষ্যকারদের নিজস্ব মন-গড়া রচনা। খোদ রামায়ণেই তো একই বিষয়ের ওপর বিভিন্ন কাহিনি দেখা যায়। তবে একথা ঠিক যে, জাতকের অদ্ভুত রামায়ণ নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই।

তথ্য ঋণ ঃ স্টাডিজ ইন দ্য বুদ্ধিস্ট্ জাতকস্— বিনয়চন্দ্র সেন।

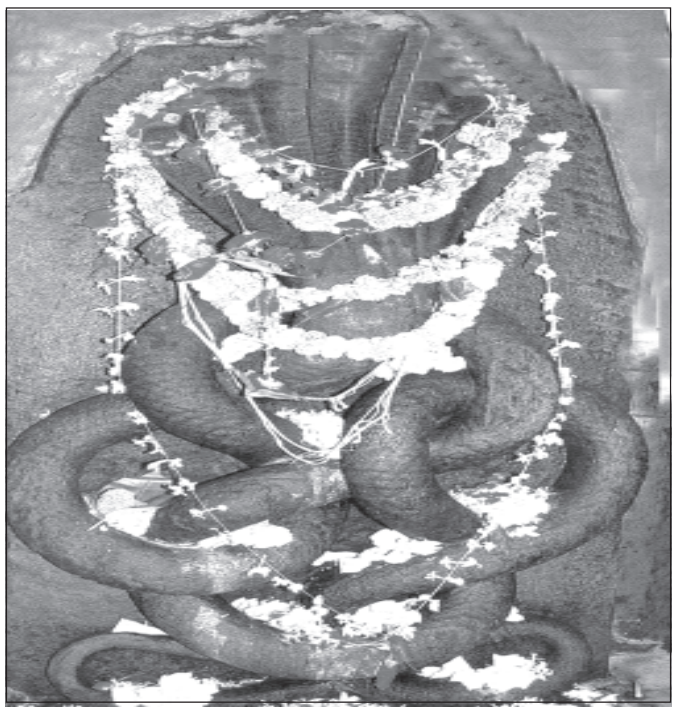

তীর্থরাজে নাগরাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। মন্দিরটির বয়স প্রায় ৪৫০ বছর। তবু আজও মন্দিরটি বিরাজ করছে লক্ষাধিক ভক্তের মনের মণিকোঠায়। ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিলে সন্ধান পাওয়া যাবে সহস্র সহস্র প্রাচীন মন্দিরের। কিন্তু তীর্থরাজ প্রয়াগের এই মন্দিরটি অজস্র দর্শনার্থী ও ভক্তদের চোখে আজও বেশ স্বতন্ত্র। কিন্তু কেন? কিসের এত কৌতূহল মন্দিরটিকে ঘিরে? রহস্যটাই বা কি? আশ্চর্যের বিষয়, এই যাবতীয় জল্পনা-কল্পনার সমাধান কিন্তু মন্দিরটির মাঝেই নিহিত রয়েছে। অথচ আর পাঁচটা সাধারণ মন্দিরের মতোই গড়ন এই মন্দিরটির। তাই কৃতিত্বের দাবিদার মন্দির নয়, মন্দিরের দেবতাটি। না ইনি কোনও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর কিংবা কালি, দুর্গা বা পার্বতী নন। ইনি হচ্ছেন নাগদেব বাসুকি। এলাহাবাদ শহরের গঙ্গার দক্ষিণ ঘাটের এই মন্দিরটি বাসুকি নাগের মন্দির বলে পরিচিত।

মন্দিরটির উৎপত্তি নিয়ে ঐতিহাসিকদের বিতর্কের যেন কোনও শেষ নেই। কথায় বলে, 'নানা মুনির নানা মত'। এই মন্দিরকে ঘিরেও সেইরকম নানা মত। কারুর মতে, মন্দিরটি নির্মাণ করেন নাগপুরের মারাঠিরা। কেউ বা আবার রেওয়ার মহারাজের কথা এর পেছনে স্বীকার করেন। বিশেষজ্ঞদের একাংশ অবশ্য মন্দিরটির নির্মাণ শিল্পের পরিপ্রেক্ষিতে জয়পুরের রাজাদের কথা উল্লেখ করেন। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতেই এলাহাবাদের বাচ্চাজি ট্যান্ডনদের বংশধরেরা এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তবে মন্দিরটি কবে নির্মিত হয় সে বিষয়ে অবশ্য একমত হতে পারেননি ঐতিহাসিকরা।

প্রতিবছর বাংলার শ্রাবণ ও মাঘ মাসে উদ্‌যাপিত হয় নাগপঞ্চমী উৎসব। সেই সময় লক্ষাধিক ভক্তের ঢল নামে মন্দির প্রাঙ্গণে। দূরদূরান্ত থেকেও বহু দর্শনার্থী আসেন নাগদেবের দর্শনে। সাড়ে ৪ ফুট দৈর্ঘ্য ও আড়াই ফুট প্রস্থ কৃষ্ণবর্ণের বাসুকি নাগের প্রতিমা তখন এক অপরূপ রূপে সাজেন ভক্তদের ফুল ও সিঁদুরের সংস্পর্শে। নাগদেবকে ঘিরে চলে ভক্তদের জয়ধ্বনি। আয়োজন করা হয় মেলারও। মন্দিরটি দাঁড়িয়ে আছে লাল পাথরের তৈরি উঁচু এক সমতল স্থানের উপর। সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে মন্দিরের দেওয়ালে আঁকা বিচিত্র কারুকার্যের চিত্রগুলি। মন্দিরের বাঁ পাশের প্রবেশদ্বারে আছে পিতামহ ভীষ্মের শরশয্যার শায়িত মূর্তি।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি দপ্তরের পাঠক ভি পি দুবে বলেন, "ভারতবর্ষে অসংখ্য প্রাচীন দেবদেবীর মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাসুকি নাগের মন্দির ভারতবর্ষে একটিই আছে। পৃথিবীতেও এটি নাগদেবের দ্বিতীয় মন্দির। সর্বত্র শিবের সঙ্গে নাগের পূজো করা হয়, কিন্তু এখানে মহেশ্বর নন, দেবতা নাগদেব স্বয়ং।" বাসুকি নাগের অস্তিত্বের কথা পুরাণকাহিনীতে পাওয়া যায়। তাই মন্দিরটির সঙ্গে যে ২০০০ বছরের প্রাচীন ইতিহাসও জড়িত আছে এ ব্যাপারেও মত প্রকাশ করেন তিনি।

স্থানীয় সূত্রানুযায়ী, মন্দিরটি বর্তমানে যে অঞ্চলে অবস্থিত, সেটা একসময় নাগরাজাদের রাজধানী ছিল। নাগরাজাদের রাজধানী ভোগবতী নামে পরিচিত ছিল। ভোগবতীর অবস্থান ছিল মাটির নিচে পাতালে। কথিত আছে, নাগরাজাদের রাজধানী বাসুকি হরদা বলে একটা পুকুরের নিচে ছিল। পুকুরটির সঙ্গে গঙ্গা নদী ও বক্সিবন্ধের যোগসূত্র ছিল। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে, মোগল সম্রাট সেই যোগসূত্রকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় বলে বিশ্বাস স্থানীয় বাসিন্দাদের। স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রচলিত মতকে সমর্থন করে ভি পি দুবে জানান, পুরাণকাহিনীতে বাসুকি, কালিয়া, পদ্মা, তক্ষক, শেষনাগ সহ অসংখ্য নাগরাজের কথা জানা যায়। তারা প্রত্যেকেই বিভিন্ন অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখত। ঐতিহাসিক সাধনা মিশ্রের মতে, "প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ সাপ' এবং সূর্যকে দেবতাজ্ঞানে পূজো করে আসছে। পুরাণকাহিনীতেও সাপকে দেবতা বলে অভিহিত করা হয়েছে। নাগদেবের পূজো ভারতীয়দের সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের শিরায় শিরায় মিশে গেছে।" এমনকী সিন্ধু-সভ্যতাতেও নাগকে দেবজ্ঞানে পূজো করার কথা উল্লেখ আছে বলে তিনি জানান। বাসুকি নাগের নামের অনুসরণে নামাঙ্কিত মন্দিরটি যে ঘাটের উপর রয়েছে সেটাকে দশাশ্বমেধ ঘাট বলা হয়। প্রচলিত মত অনুযায়ী, ভাগবান বিষ্ণু একবার ১০টি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন এই ঘাটটিতে। তারপর থেকেই ঘাটতির এমন নামকরণ হয়।

তাই নিছকই একটি প্রাচীন মন্দির নয়, লক্ষ লক্ষ ভক্তবৃন্দের বিশ্বাস ও ভক্তির জীবন্ত প্রতীকও এই নাগদেবের মন্দির।

শুধুই কেরিয়ারিস্টিক নয়, সন্তানকে সুস্থ-স্বাভাবিক করে গড়ে তুলুন

ইন্দিরা রায়।। আজকের দিনে শিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত পরিবারে একটি বা দু'টি সন্তানকে মানুষ করতে বাবা-মা ছুটে চলেছেন এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। সকাল থেকে সন্ধ্যে। সন্তানকে কেরিয়ারিস্ট গড়ে তোলা তাদের স্বপ্ন— কিন্তু তারা বুঝছেন না যে সন্তান কেরিয়ারিস্ট হতে সক্ষম হলেও সে কিন্তু কিছুটা হয়ে ওঠে প্রবলেমেটিক। এখনকার বাবা-মা হয়ত একথা মানতে চাইবেন না। যুক্তি দেখাবেন, আমাদের সন্তান জীবনের সব স্তরেই ভাল রেজাল্ট করেছে। গেট, নেট, স্লেট আরও যা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা আছে, সবেতেই যোগ্যতার সঙ্গে সফল। তবে, কেন সে প্রবলেমেটিক।

প্রবলেমেটিক এই অর্থে যে তাকে যথাযথ সামাজিকভাবে গড়ে তোলা হয়নি। অথচ আজ থেকে আরও এক শতাব্দী আগেও সামাজিক ছবিটা দেখলে যে ছবিটা ফুটে ওঠে তাতে দেখা যায় যে, তখনকার ছেলেমেয়েরা হয়ে উঠত স্বাভাবিক। সেই সময়ে ছিল যৌথ পরিবার। বাড়ি ভর্তি ছিল বাবা-কাকা-জেঠার ছেলেমেয়ে মিলে অনেক সন্তান। বাবা-মার কোনও টেনশন থাকত না ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যত নিয়ে। একসঙ্গে পড়াশোনা স্কুলে যাওয়া ছিল সেই সব সন্তানদের নিত্যকাজ। ভবিষ্যতে দেখা যেত তাদের প্রত্যেকেই হয়ে উঠেছে কৃতি সন্তান। শুধু পড়াশোনা নয়, সামাজিক ক্ষেত্রেও। সুস্থ, সবল এক সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে সফল হয়েছে। কিন্তু এখনকার অনু পরিবারে একমাত্র সন্তানকে আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব থেকে দূরে সরিয়ে একা একা বড় করে তোলার কঠোর দায়িত্ব, পরিশ্রম পালন করছে বাবা-মা। অতিরিক্ত মনোযোগ, প্রশ্রয় ও প্রাচুর্যে সন্তান বড় হয়ে জেদি ও স্বার্থপর হয়ে ওঠে। পাঁচজনের সঙ্গে ভাগ করে নিতে শেখে না। কোনও স্বার্থত্যাগ করতে সে জানে না। যা মনে করবে সেটাই সে করে বসে, কারোর বাধা বারণ মানে না। ছোট থেকেই কোনও দায়িত্ব পালন করতে শেখে না বলে বড় হয়ে কোনও দায়িত্ব পালন না করে বৃদ্ধাবাসে পাঠিয়ে দিয়ে তার কর্তব্য সমাধান করতে চান। এক্ষেত্রে কি সেই শিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত সন্তানকে উপযুক্ত সন্তান বা মানুষের মতো মানুষ হিসেবে আখ্যায়িত করা ঠিক হবে। অনু সংসার থেকে ভোগবাদী সমাজে দাঁড়িয়ে সে লালসা ও প্রলোভনের শিকার হয়। বর্তমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাই

মানুষকে অতিরিক্ত আত্মসচেতন ও স্বার্থপর করে তুলছে। একদিন শৈশবে যে শিক্ষা একটি সন্তান পায়, তাকেই কাজে লাগায় নিজের সন্তানদের প্রতি। ফলেই সেও সেই অনু পরিবারের সদস্য হিসেবে ভবিষ্যতে আরেকটা অনু পরিবারের জন্ম দেয়। আজ এই ছবিটা এতটাই প্রকট যে যার ফলে বৃদ্ধাশ্রম গড়ে উঠছে একাধিক। যে ধারণাটা বেশ কয়েক বছর আগেও মানুষ ভাবতে পারেনি। বিশেষত বাঙালি তথা ভারতীয়দের সামাজিক কাঠামোর মধ্যে। এই তো সেদিন উত্তরপাড়ার একটি দোকানে কর্মসূত্রে পরিচিত এক বনেদি মহিলার সঙ্গে হঠাৎ দেখা। দেখে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করি আপনি এখানে? দু'চোখ জলে ভরে উঠলেও তা মুছে নিয়ে বলেন, আমি তো এখন এখানকার বৃদ্ধাবাসে থাকি।

সেকি! পল্টুদা কোথায়? ও, ও তো এখন মস্ত বড় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। কানাডায় চলে গেছে। এখানকার সব পাট মিটিয়ে। তাই...। ভাবলাম, এক ছেলেকে কষ্ট করে মানুষ করার এই পরিণতি।

নীতা পিসির জীবনে এখন খুব অশান্তি। কারণ, ছেলে ঋতুকে আগলে বড় করেছেন। এখন পিলানিতে ফাইনাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সফল ছাত্র। কিন্তু ইদানীং তার একটাই পরিচয় সে ড্রাঙ্কার। এই কী চেয়েছিলেন তিনি!

এর জন্য দায়ী মায়েরা। সকলের কাছ থেকে সরিয়ে রেখে দু'কামরার কুঠুরিতে বদ্ধ জীব করে তার প্রতি অতিরিক্ত নজর দিয়ে সব আবদার জেদকে প্রশ্রয় দিয়ে তাকে ভবিষ্যতের এক বিদ্রোহী স্বেচ্ছাচারী সন্তান করে তোলা হয়। সে বেপরোয়া হয়ে পড়ে। তার থেকেই এ ধরনের আচরণ ধরা পড়ে।

সুতরাং সন্তানদের সর্বতোভাবে দেখতে হবে যে সে সুস্থ সামাজিকভাবে বড় হয়ে ওঠে। যৌথ পরিবার ভেঙে আজ দু'কামরার ঘরে শুধুমাত্র বাবা-মার সান্নিধ্যে না রেখে আর পাঁচজন সমবয়সীর সঙ্গে মিশতে দিন। জেদকে প্রাধান্য দেবেন না। অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবেন না। আর্থিক স্বাচ্ছল্য থাকলেও কষ্ট করতে শেখাবেন। এই পরামর্শ মনস্তত্ত্ববিদদের। তবেই ভবিষ্যত জীবনে সব রকম পরিস্থিতিকে মানিয়ে নিতে পারবে সন্তান। আজ যদিও যৌথ পরিবার নেই, তবুও এই একসঙ্গে থাকার ইচ্ছে বা ঐতিহ্যকে নষ্ট করছে অর্থনৈতিক কারণ। আর্থিক অবস্থানুযায়ী একটি বা দুটি সন্তানকে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে বড় করে তোলার চেষ্টা করলেও মানসিকতভাবে সে অসহ্য হয়ে ওঠে। নিঃসঙ্গতা তাকে আঁকড়ে ধরে। মনের আদান-প্রদান ঘটে না তার। এই নিঃসঙ্গতা কৃতী সন্তানের জীবনে নিয়ে আসে হতাশা। ফলে সংসার-সমাজে সে সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সুতরাং সন্তানকে কেরিয়ারিস্ট শুধু নয়, তার সঙ্গে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন গড়তে সাহায্য করুন।

।। চিত্রকথা ।। পরশুরাম।। ৮

একান্ত সাক্ষাৎকারে তরুণ বিজয়

‘সমঝোতার প্রশ্ন নেই, অযোধ্যায় রামমন্দির হবেই’

বিজেপির সর্বভারতীয় মুখপাত্র এবং রাজ্যসভার সাংসদ, একদা সফল সাংবাদিক শ্রী তরুণ বিজয় সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন। এক অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকারে অনেক বিষয়ে সরাসরি খোলামেলা উত্তর দিয়েছেন স্বস্তিকার সহকারী সম্পাদক বাসুদেব পাল-এর কাছে। তাঁর সেই সাক্ষাৎকারটি এখানে পুরোপুরি প্রকাশ করা হলো।

❑ আপনি আজকের এই পদমর্যাদায় কিভাবে পৌঁছালেন?

● আমি ছোটবেলা থেকেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। আমার বাবাও দেশভাগের অনেক আগেই লাহোরে স্বয়ংসেবক হয়েছিলেন। লাহোরে সঙ্ঘকাজের সূত্রপাত করার উদ্দেশ্যে সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ার নাগপুর থেকে সেই সময়ে পাতুরকরজীকে (রাজাভাও পাতুরকর) পাঠিয়েছিলেন। পাতুরকরজী আমাদের বাড়িতেই থাকতেন। উনিই বাবাকে স্বয়ংসেবক করেন। পরে আমরা উত্তর ভারতে চলে আসি। আমার জন্ম দেরাদুনে। ওখানেই শাখাতে যেতাম। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। পূজ্যপাদ স্বামী রঙ্গ নাথানন্দজী আমাকে খুবই স্নেহ করতেন (ভালোবাসতেন)। উনার লেখা অনেক চিঠি আমার কাছে এখনও আছে। সঙ্ঘের শাখার মাধ্যমে বিবেকানন্দের চিন্তাধারাকে বুঝেছি। পরে আমাকে বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এজন্য বেলুড় মঠে একমাসের প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছিল। ওখানে প্রমুখ ছিলেন নবনীহরণ মুখোপাধ্যায়। পরে আমি পাঁচবছর সঙ্ঘকাজে পুরো সময় দিই প্রচারক হিসেবে। আমাকে সে সময় কল্যাণ আশ্রমের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। পরে পূজনীয় রজ্জু ভাইয়া আমাকে ‘পাঞ্চ জন্য’ সাপ্তাহিকে দায়িত্ব নেওয়ার কথা বলেন। প্রায় দু’দশক পাঞ্চ জন্য পত্রিকার সম্পাদক ছিলাম। সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব ধরলে প্রায় ২৯ বছর পাঞ্চ জন্যে ছিলাম। আমি সে সময় ‘ব্লিৎস’ পত্রিকায় ইংরেজীতে লেখার অভ্যাস করি। সম্পাদক রুসি করঞ্জিয়ার সঙ্গে আমার খুব হৃদ্যতা ছিল। তখন আমি হিন্দুস্থান টাইমস্, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ফেমিনা প্রভৃতি পত্রিকায় জাতীয়তাবাদী প্রবন্ধ লিখতাম। ব্লিৎস্ পত্রিকায় নাগারাণী গাইদিন ল্যু’র আমার নেওয়া সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছিল। পূজনীয় শেষাদ্রিজী তাঁর বইয়ে ওই সাক্ষাৎকার-এর উল্লেখ করেছেন। ওই সাক্ষাৎকারের গুণমান এতটাই ভালো ছিল। পরে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলজীর সঙ্গে চীনে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। তিনি তাঁর প্রায় সব বিদেশ সফরে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। চীনের সঙ্গে আমাদের (ভারত) সম্পর্ক ক্রমশ ভালো হয়। আমাকে চীনের সিচুয়ান বিশ্ববিদ্যালয় এক ফেলোশিপ দেন। ফলে অনেকবার চীনে যেতে হোত। পাঞ্চ জন্যেও অনেক সময় দিতাম। তখন সঙ্ঘের অধিকারীরা আমাকে অ্যাকাডেমিক ও তাত্ত্বিক কাজ করার জন্য বলেন। এবং ‘শ্যামাপ্রসাদ ফাউন্ডেশন’-এর দায়িত্ব নিতে বলেন। ২০০৭-এর ফেব্রুয়ারি মাসে শ্যামাপ্রসাদ ফাউণ্ডেশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ওই বছরই আমাকে ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যকারিণীর সদস্য মনোনীত করা হয়। আমি তখন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ ও পণ্ডিত দীনদয়ালজীর জীবনী ও অন্যান্য মুদ্রিত লেখা গভীরভাবে অধ্যয়ন করি। শ্যামাপ্রসাদের বাড়িতে কলকাতায় একটি তাঁর জীবিত সময়ের দুষ্প্রাপ্য সব ছবির প্রদর্শনী করবো স্থির করি। এবার আমাদের পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক মোহনজী এবং বিজেপি সভাপতি নীতিন গড়করি সেই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছেন। বাংলার তথা ভারতের যুবকদের কাছে শ্যামাপ্রসাদের আদর্শকে তুলে ধরার এক ব্রত নিয়ে আমি কাজ করছি। ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয় দিল্লীতে বিজেপি’র প্রধান কার্যালয়েই রয়েছে। (প্রসঙ্গত, শ্রী তরুণ বিজয় শ্যামাপ্রসাদ ফাউণ্ডেশনের ডিরেক্টর)।

❑ সফল সম্পাদক সফল সাংবাদিক হওয়ার পরও রাজনীতিতে এলেন কেন?

● দেশে হিন্দুত্ব এবং হিন্দুদের প্রতি একরকমের বৈষম্যের দৃষ্টি (বৈমনস্ব) রয়েছে। আমরা মনে করি হিন্দুত্ব এদেশের আত্মাস্বরূপ। আমেরিকার বিষয়ে স্যামুয়েল হান্টিংটন বলেছেন আমেরিকার মৌলিক চরিত্রই হলো— ল্যাটিন খৃস্টান। তেমনই ভারতের পরিচয়— গঙ্গা, হিমালয়, বিবেকানন্দ, শ্যামাপ্রসাদ, প্রদীপ প্রজ্বলন ও নারিকেল দিয়ে অনুষ্ঠান আরম্ভ, বদরী-কেদার, দক্ষিণেশ্বর। এসব বাদ দিয়ে ভারতের কোনও পরিচয়-পরিচিতি হতে পারে না। আজকের রাজনীতিতে হিন্দু-বিরোধিতা লাভদায়ক। হিন্দু স্বার্থকে আঘাত করার অর্থই ভারতবর্ষকে আঘাত করা। যে এলাকায় হিন্দুদের সংখ্যা কম হয়েছে সেখানেই হিন্দুস্থানের এলাকা কমেছে। তা উত্তর পূর্বাঞ্চ ল হোক বা জম্মু-কাশ্মীর অথবা অন্য কোনও ক্ষেত্র হোক না কেন। এজন্য আমরা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ ও পণ্ডিত দীনদয়ালজীর জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা নিয়ে চলেছি এবং দিন দিন তাকে আরও মজবুত, পরিপক্ক, পরিপুষ্ট করতে চাই। এই মনোভাব তো মনে ছিলই। তাই নিয়ে পাঞ্চ জন্যতে কাজ করেছি। শাখাতে শিখেছি, পূজনীয় রজ্জু ভাইয়ার কাছে শিখেছি। সেজন্য একরকম চ্যালেঞ্জ স্বীকার করে রাজনীতিতে আসা। আমি সদাসর্বদা চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করেছি। যেমন, ‘সিন্ধু দর্শন’ অনুষ্ঠান, লাদাখে আমাদের আদর্শবাদকে নিয়ে যাওয়া— এসব ছিল।

❑ বিজেপি এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, সাম্প্রতিক সময়ে দুটি পৃথক সংগঠনের সম্পর্ক নিয়ে অনেক জলঘোলা হয়েছে। বিশেষত, পত্র-পত্রিকায়। এটাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

● আমি মনে করি সঙ্ঘই মূল সংগঠন —মাদার উইং। সঙ্ঘরূপী গঙ্গা থেকে অনেক সংগঠন। সঙ্ঘ ভাগীরথী। যেমন, ভগীরথ গঙ্গাকে এনে কেবল সগরপুত্রদেরকেই উদ্ধার করেননি, গঙ্গা অনেককে ধন্য করেছে। অটলজীর কবিতায় একথা ব্যক্ত হয়েছে। সঙ্ঘরূপী গঙ্গা আমাদের রাষ্ট্রজীবনের বহু ক্ষেত্রকে অনুপ্রাণিত ও স্পন্দিত করেছে। এর মানে এটা নয় যে, সঙ্ঘ আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ বা কন্ট্রোল করে। সঙ্ঘের চিন্তাধারা থেকে বিদ্যার্থী পরিষদ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, কল্যাণ আশ্রম, শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক সংগঠন নির্মাণ হয়েছে। এসবই রাষ্ট্রের পরম বৈভবের জন্য রাষ্ট্রজীবনের বিবিধক্ষেত্রে কর্মরত স্বয়ংসেবকদের দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন সংগঠন। এর মানে এই নয় যে, সঙ্ঘ তাদেরকে নিয়ন্ত্রিত করে। সবই স্বশাসিত সংগঠন। এরকমই বিজেপিতেও স্বয়ংসেবকরা জাতীয়তাবাদ ও পরম বৈভবের কল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। যে কারণে ৩৭০ ধারা হঠানো, অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়ন, দেশে

স্বস্তিকার সম্পাদক বিজয় আঢ্যের সঙ্গে তরুণ বিজয় ।

কমন সিভিল কোড লাগু করা, গোহত্যার উপর নিষেধাজ্ঞা, দেশের অভ্যন্তরে নকশালী সন্ত্রাস ও জিহাদী আতঙ্কবাদ ধবংস করার জন্য একটা পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। স্বয়ংসেবকরা বিজেপিতে আছেন বলেই এসব দাবী উঠছে। ভারতবর্ষে কোনও রাজনৈতিক দলই এই সব বিষয়ে বলে না। এসব সঙ্ঘের আদর্শবাদের অবদান। একারণে উপরোক্ত বিষয় নিয়ে আমরা রাজনীতিতে রয়েছি। কোনও দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই, দ্বিধা তাদের আছে যারা কোনও খবর না রেখে সেকুলার ড্রইংরুম পলিটিক্স করেন।

❑ এই আদর্শবাদ নিয়ে রাজনীতিতে বিজেপি কতটা সফল বা সাফল্য পেয়েছে?

● আরও অনেক বেশি করে কাজ করার দরকার। আমি মনে করি বিজেপি যে সকল বিষয় সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত করেছে তা ভারতের অন্য কোনও দলই তোলেনি। যেমন— অযোধ্যা, কাশ্মীর থেকে বিতাড়িত উদ্বাস্তু হওয়া হিন্দুদের পুনর্বাসনের বিষয়। গোহত্যা বন্ধ, উত্তর পূর্বাঞ্চ লে স্বদেশপ্রেমী ভারতবাসীদের ধর্মান্তরকরণ বন্ধ করা, কাশ্মীরে ‘দো নিশান’ (দুটি পৃথক পতাকা) হঠানো প্রভৃতি বিষয় রয়েছে। আরও অনেক দূর যেতে হবে, অনেকটাই অসমাপ্ত। এটা তখনই সম্ভব যখন একজন সাধারণ কার্যকর্তার মনে আদর্শবাদ দৃঢ় হবে। এজন্য বর্তমান সভাপতি শ্রী নীতিন গডকরি এক বিরাট যোজনা হাতে নিয়েছেন। বিজেপির ইতিহাসে এটা এক যুগান্তকারী অভূতপূর্ব যোজনা। উনি তিন ভাগে প্রশিক্ষণকে ভাগ করেছেন— প্রথম, প্রগত (অগ্রগতি) এবং প্রবীণ। এ এক নতুন দিক। কেননা, অনেক নতুনরা দলে আসছেন। সবকিছু জানেন না। তাদের মনে আদর্শবাদ পরিপক্ক ও মজবুত হওয়া প্রয়োজন। আমরা সঙ্ঘ থেকে সংস্কার পেয়েছি সেই সংস্কার বিজেপির কার্যকর্তাদেরও হোক। এজন্য প্রশিক্ষণবর্গ প্রভূত সহায়তা করবে। আমরা এর ফলে দেশবৈরিদের শায়েস্তা করতে সফল হবো।

❑ ১৯৯০ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত কেন্দ্রের রাজনীতিতে বিজেপির যে শক্তি ছিল তা ২০০৪-২০১০-এর মধ্যে দুর্বল হয়েছে....

● ভারতীয় জনতা পার্টি একসময় বারোটি রাজ্যে কোয়ালিশন সহ শাসন করেছে, বর্তমানে দেশের প্রধান বিরোধী দল এবং ছয়টি রাজ্যে ক্ষমতায় আছে। কেন্দ্রেও ইউপিএ এবং এন ডি এ-র মধ্যে পার্থক্য খুব বেশি নেই। এটা ভারতীয় গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে একপ্রকার দুর্দৈব বলা যেতে পারে। দেখা যায়, কম ভোট পেয়েও বেশি আসন আবার বেশি ভোট পেয়েও কম আসন। এটাই ভোটের গাণিতিক দিক (Election-Mathematics)। এটা ঠিক যে, আমরা কিছুটা পশ্চাৎ অপসরণ করেছি। তবে আগামী নির্বাচনে আমরা আবার ক্ষমতায় ফিরব এই বিশ্বাস নিয়েই আমরা কার্যকতাদের নিয়ে কাজ করছি।

❑ দেখা গেছে ক্ষমতায় থাকার সময় বিজেপি ‘রামমন্দির’ নিয়ে বেশ নীরব ছিল, এসময়ে বিজেপির বক্তব্য কি?

● শ্রীরামমন্দির আমাদের বিশ্বাস, আস্থার স্তম্ভস্বরূপ। আমরা দায়িত্ববদ্ধ। শপথপূর্বক কটিবদ্ধ। শ্রীরামজন্মস্থানে সুন্দর সুদৃশ্য মন্দির তৈরি করেই আমরা ক্ষান্ত হব। এখানে কোনওরকম সমঝোতা বা বোঝাপড়ার অবকাশই নেই। মন্দিরের জন্য আমাদের কার্যকর্তারা জীবন বলিদান দিয়েছেন। কোঠারী বন্ধুদের মতো অনেকেই বলিদান দিয়েছেন। করসেবকরা রাষ্ট্রের সম্মান ও স্বাভিমানের জন্য বলিদান দিয়েছেন। এক্ষেত্রে বোঝাপড়া করলে তার থেকে বড় পাপ আর কিছুই হতে পারে না। কেউ যদি সঙ্গ দেয়, না দেয়, বিরোধিতা করে— তবুও আমরা মন্দিরের বিষয়ে কোনওরকম সমঝোতা স্বীকার করব না। এব্যাপারে সকল নেতাই প্রতিবদ্ধ, একমত। অযোধ্যায় রামমন্দির হবেই। কোনও পরিস্থিতিতেই আমরা ঝুঁকব না, রুখব না, পশ্চাৎ অপসরণ করব না।

❑ প্রথমবার সভাপতি হিসেবে কলকাতার জনসভায় নীতিনজী রামমন্দির, কমন সিভিল কোড, ৩৭০ ধারা হঠানোর বিষয়ে কিছু বলেননি, এটা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে—

● দুনিয়া জানে বিজেপির দৃঢ় নীতি— শ্রীরামমন্দির, সমান নাগরিক আইন, ৩৭০ ধারার বিষয়ে। এটা বার বার বলার দরকার নেই। এটাই বিজেপির রক্তে, জিনে রয়েছে, দেশের চল্লিশ শতাংশ লোক প্রতিদিন মাত্র কুড়ি টাকায় জীবনযাপন করেন। ‘ভুখে ভজন না হোই গোপালা’। সাধারণ মানুষকে অন্ন, পানীয় জল, শিক্ষা এবং উর্জা (স্বাস্থ্য) দিতে হবে। একথাই সাংসদ হওয়ার পর উত্তরাখণ্ডেও বলেছি। আমরা সঙ্ঘে একথাই শিখেছি— যতদিন না সাধারণ মানুষের উন্নয়ন হচ্ছে দেশ উন্নত হবে না। সেক্ষেত্রে রাজনীতি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

❑ বিজেপির নেতাদের মধ্যে মাঝে পরস্পর মতপার্থক্য প্রকাশ্যে আসছে। যেমন, ‘জিন্না’ নিয়ে.....

● বর্তমান ভারতবর্ষে বিজেপি একমাত্র গণতান্ত্রিক দল। অন্যান্য অনেক দল তো ব্যক্তিগত জমিদারির মতো। কোনও দল জয়ললিতার, কোনও দল করুণানিধির, কোনও দল, মুলায়মের, কোনও দল অমর সিং-এর, কোনও দল মায়াবতীর, মমতার, মুফতির, আবদুল্লার। বিজেপি কার্যকর্তাদের দল। মনমোহন বা প্রণব মুখার্জী কোনওদিনই কংগ্রেস সভাপতি হতে পারবেন না। কোনও এক বিষয়ে মতভেদ সুস্থ স্বাভাবিকতার লক্ষণ। তবে তা প্রকাশ্যে, বাজারে আসা উচিৎ নয়। কার্যকর্তাদের মনের ব্যথা বুঝতে হবে। বিজেপিতে পোস্টার মারা সাধারণ কর্মীও দলের সর্বভারতীয় সভাপতি হন।

❑ এসময়ে আপনার ভূমিকা কি?

● আমি নিজেকে এসময় যুদ্ধ ক্ষেত্রের এক সাধারণ সৈনিক বলে মনে করি। ভারতসীমান্ত দুই পরমাণুশক্তিধর দেশের আক্রমণের সম্মুখীন— চীন ও পাকিস্তান। দুদেশের সঙ্গেই আমাদের শত্রুতার সম্বন্ধ। আমেরিকাও প্রতিবেশি দেশে ঘাঁটি গাড়ছে। দেশের অভ্যন্তরে— জিহাদি সন্ত্রাসবাদ, নকশালী আতঙ্কবাদ এবং ভ্যাটিকান প্রেরিত আতঙ্কবাদ (আমি খৃস্টমতে মতান্তরণকে ভ্যাটিকানের সন্ত্রাস বলে মনে করি) সক্রিয়। ভারতকে ক্ষত-বিক্ষত করছে। এসময়ে দেশের মূলভূত চেতনা জাগ্রত করা আমি রাজনৈতিক ধর্ম বা কর্তব্য বলে মনে করি— একজন স্বয়ংসেবক হিসেবে। এজন্যই রাজনীতিতে এসেছি। অনেকেই রাজনীতিতে আসেন। বিলাসে জীবনযাপন করেন। তারপর একদিন চলে যান। আমি তা নই। ভারতে রাণাপ্রতাপ বনে-পাহাড়ে থেকে হলদিঘাটিতে যে লড়াই করেছেন তাই দেশের লোক শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। মুগল সেনাপতি বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত মানসিংহের কোনও সম্মান নেই।

আমি ডাক্তার হেডগেওয়ার শ্রীগুরুজী, পতিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, অটলবিহারী বাজপেয়ীদের আদর্শ নিয়ে চলি। এখন ভারতের সুরক্ষার সামনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বিগত ১০০ বছরে ভারতের ভৌগোলিক আয়তন প্রায় অর্দ্ধেক হয়ে গেছে। হিন্দুদের হ্রাস হয়েছে। কাবুল তো আগেই গেছে। এখন তো জম্মুর রাজৌরি, পুঞ্চ -এ সংকট বাড়ছে। স্বাধীনতার পর ভারতেই প্রায় পাঁচ লক্ষ হিন্দুরা শরণার্থী। স্বদেশে উদ্বাস্তু। এর থেকে লজ্জা, ধিক্কার, অপমান আর কি হতে পারে? চেতনা জাগ্রত করতে হবে। হিন্দুরা কোথায় যাবে। এদেশে হিন্দুরা সংগঠিত হলে সংখ্যালঘুদেরও কল্যাণ হবে। সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা, উন্নয়ন ও কল্যাণের সবথেকে বড় গ্যারান্টি হলো হিন্দু সংগঠন। এসব নিয়েই রাজনীতিতে এসেছে।

❑ রাজনীতির মাধ্যমে পরমবৈভব সম্ভব?

● রাজনীতি এর মাধ্যম নয়, নাঃ। যাঁরা নিস্বার্থভাবে সমাজ-দেশ-রাষ্ট্রের কাজ করছেন তাদের সাহায্য করতে পারে। পরিবেশ তৈরি করতে পারে। বাধা দূর করতে পারে। সাফাই -কর্মীর ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু পরমবৈভব তাদের দ্বারাই সম্ভব যারা সর্বস্ব ত্যাগ করে বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে সমাজজীবনের বিবিধ ক্ষেত্রে তপস্বীর মতো কাজ করে চলেছেন। রাজনীতি সহায়ক, মাধ্যম নয়।

রাজনীতি ও আজকের পশ্চিমবঙ্গ

(৩ পাতার পর)

কাজকর্মে যোগদান ও নগরায়ণের অনিবার্যতা এই সব মূল্যবোধ ও রকমফেরের অন্তর্নিহিত কারণ। (২) অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন বা 'গ্লোবালাইজেশন'-এর কারণে সময় ও দূরত্ব সংকুচিত হয়ে যাওয়ায়, প্রতিযোগিতার বাতাবরণ অস্বাভাবিক বেড়ে গেছে। ফলে মানুষ আজ ক্রমবর্ধিতভাবে অসহিষ্ণু-অসহায় ও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। মানুষে মানুষে পারিবারিক সম্পর্ক ক্রমাগত অর্থহীন হয়ে মানুষ আজ এক পণ্যে পরিণত হয়ে উঠেছে বা ব্রান্ডভিত্তিক হয়ে উঠেছে। (৩) বিশ্বজনীন সঞ্চার ব্যবস্থার প্রসার বা 'ইউনিভারসাল কানেক্টিভিটি'। বিজ্ঞান ও 'ন্যানো' প্রযুক্তির ফলশ্রুতি এটি যার বাস্তব রূপ হলো 'নেট ওয়ার্কিং অফ নেটস'। (৪) খোলামেলা আদান প্রদানের স্বচ্ছ পরিবেশ বা 'ট্রানজ্যাকশনাল ট্রান্সপারেন্সি'। আই টি, আই টি এস এবং আই সি টি-র কারণে এবং তথ্য জানার আইন এই দিকে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনে দিয়েছে। (৫) সামাজিক পরিবর্তনের আত্মস্থকরণ বা 'সোস্যাল এ্যাডপটেশন'। যদিও এর পথে অজ্ঞতা-দারিদ্র্য শোষণ চালানো স্বার্থপর নেতৃত্ব, সরকারের উপর প্রয়োজন অতিরিক্ত নির্ভরতা ও সর্বোপরি ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষতার মতো বিষয়গুলি প্রচন্ড বাধা সৃষ্টি করছে। মোদ্দা কথা, আজকের জাতীয় চিন্তায় এই ৫টি দিককে সম্পূর্ণভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। আর আজকের একবিংশ শতাব্দিতে ভারতের স্বকীয়তা বজায় রেখে এই মিশিয়ে দেওয়াটাই, নেতা নেতৃবৃন্দের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আর তাই, সেই রকম নেতা ও নেত্রীর জন্য আমরা সাধারণ মানুষ অধীর আগ্রহে চোখ কান খুলে অপেক্ষা করছি।

এই পাঁচ প্যাঁচ-পয়জারকে আত্মস্থ করে, প্রকৃত জীবন চালাতে দরকার এক পূর্ণ ও নতুন ধরনের জীবন দর্শন বা এক একাত্ম মানব দর্শন। কিন্তু তা না হয়ে, আজকের পশ্চিমবঙ্গে আমরা লক্ষ্য করছি মুখে গণতান্ত্রিক, কিন্তু ভাবনায় মার্কসিস্ট, ভয়ঙ্কর স্বার্থান্বেষী এক ক্ষমতা লোভী 'আমরা-ওরার' দলকে। উদাহরণ বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য বললেন —'আমরা ২৩৫ আর ওরা ৩০', প্রয়াত সুভাষ চক্রবর্তী বললেন, চাকুরী শুধু আমার পার্টির শহীদদের পরিবারকে। শোক প্রস্তাবের ব্যাপারে দলের না হওয়ার কারণে প্রয়াত কালিপদ মুখার্জীর মৃত্যুর পর জ্যোতি বসুর বিধানসভায় উঠে না দাঁড়ানোর দাম্ভিক অসৌজন্যতা এবং দিনহাটায় মৃত ফরোয়ার্ড ব্লকের শহীদদের নাম শোক তালিকায় সংযুক্ত না করা। এই অসৌজন্যতা এক ধরনের দৈন্য রাজনৈতিক মানসিকতার বা 'পলিটিক্যাল মাইন্ডসেটের' পরিচয় দেয়। রাজনীতি যদি দেশ ও সমাজকে এক করে তাদের সুখ, সমৃদ্ধির সুরক্ষা নিশ্চিত করার হাতিয়ার হয়, তাহলে উপরে বর্ণিত অসৌজন্যতা-দাম্ভিকতার রাজনীতি কল্যাণকর হতে পারে কি? তা কি কাম্য? না, অবশ্যই নয়। তাই তৃতীয় সংহতির সুযোগ সদ্ব্যবহার করতে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিকে বিকল্প ধাঁচে ঢেলে সাজানো দরকার। দরকার সম্পূর্ণ রি-ইঞ্জিনিয়ারিং। যার লক্ষ্য হবে, সুশাসন দলতন্ত্র নয়, এক দলদাসহীন প্রশাসন, উন্নয়ন ও দলমত নির্বিশেষে সমস্ত নাগরিকদের জন্য এক সার্বিক নিরাপত্তা। এক অর্থে খাদ্য-পানীয়-জল-বস্ত্র-পরিবেশ বাসস্থান-চিকিৎসা-শিক্ষা-বিনোদন এর প্রভূত উন্নতি। এটা অবশ্য আমাদের জানা দরকার, যে 'কমিউনিস্ট চিন্তাধারা' আর 'উন্নয়ন' দুটি জিনিস এক ধরনের সোনার পাথরবাটির মতো। এখন দেখে নেওয়া যাক, উন্নয়নের সংজ্ঞা কি? উন্নয়নের লক্ষ্য কি? মানুষের জীবনের গুণগত মান বাড়ানোই হলো উন্নয়নের লক্ষ্য। কি করলে তা হবে? ১৯৯১ সালের ওয়ার্ল্ড ডেভলপমেন্ট রিপোর্ট বলছে— "it encompasses, as ends in themselves, better education, higher standards of health and nutrition, less poverty, a cleaner environment, more equality of opportunity greater individual freedom and a richer cultural life." এখন প্রশ্ন হলো, কি করলেও কোনও ভাবে এই উন্নয়ন সম্ভব?

আজকের বাংলার নাম পশ্চিমবঙ্গ। ১৯৪৭ সালের পরের বাংলা। এটা দেশ ভাগের শিকার হওয়া বাংলা। স্বপ্নভঙ্গের, অবক্ষয়ের ঝড় ঝাপটার চিহ্ন তার সর্বাঙ্গে। এমনটাই কি চেয়েছিলাম? এমনটি কি হবার ছিল? না, ছিল না। নূতন ভারত কেমন হবে, ২৩ আগস্ট ১৯০৭ সালে, বেঙ্গল ন্যাশানাল কলেজের অধ্যক্ষ পদ ছাড়ার সময় তাঁর বিদায়ী ভাষণে শ্রী অরবিন্দ ছাত্রদের কাছে দেশ ও দেশমাতৃকার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলছেন— "To see in it the foundation.....of the new India.....on that day of glory and greatness when India will work for the world.....What has been insufficiently, and imperfectly begun by us, it is for you to complete and lead to perfection...study for her sake...for her service...live for her sake...go abroad...bring back knowledge...do service to her...that she may prosper... suffer that may rejoice."

শ্রী অরবিন্দের এই কথার মধ্যে ভারতের চিন্তা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। ভারতের কথা থাকলেও, বিশ্বজনীনতার ছাপ এই ভাষণের ছত্রে ছত্রে। তাঁর ভাষণে কূপমন্ডুকতার কোনও জায়গা নেই। 'আমরা-ওরার' কোনও জায়গা নেই। যেটা আছে, সেটা এক অখন্ড অস্তিত্বের স্বপ্ন। আর তাই, দ্বিখন্ডিত ভারত দেখার পর তিনি বলছেন, "The division must go. Unity must and will be achieved for it is necessary for the greatness of India's future." এই হলো বাংলা। এই হলো বাংলার মানুষের মানসিকতা ও স্বপ্ন। এই হলো ভারতের জাতীয়তাবাদ ও তার মর্মকথা। কি ১৯০৭-কি ১৯৪৭-কি ২০১১ এই লক্ষ্য থেকে সরে গেলে চলবে না। দরকার জাতীয়তাবোধ ভিত্তিক তীব্র সাংস্কৃতিক মানসিকতার উন্মেষ। দরকার সঠিক আদর্শের বা 'আইডিয়ালসের' যা মতবাদ বা 'ইডিওলজি' ভিত্তিক না হয়ে হবে 'এম আই সি' ভিত্তিক। 'এম' মানে 'মাদারল্যান্ড' (মা), আই মানে 'আইডিয়ালস' (আদর্শ) ও 'সি-ক্যারেকটার' বা (স্বচ্ছ রাজনৈতিক সততা ও চরিত্র) ভিত্তিক। এই তিন ভিত্তি ভূমির উপর দাঁড়িয়ে জনকল্যাণে বা লোকবৃত্তে— তার প্রতিফলন ঘটাতে সেই রাজনৈতিক পরিকাঠামো হবে বাংলার ইতিহাস অনুকূল, প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাজবৃত্ত। 'ডেমোক্রেটিক রুল অফ ল', নাকি কৌশলী 'রুল বাই ল'। রাজবৃত্তে দেশভক্তির রস মেশানো থাকবে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে। কারণ এই দেশভক্তি ছাড়া রাজবৃত্তের রূপ হয়ে উঠবে জার্মানীর হিটালর, রাশিয়ার স্ট্যালিন ও কাম্পুচিয়ার পলপটের শাসনের মতো। ফলে সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম বা তারপরের হার্মাদি সন্ত্রাস-গণহত্যা-গণসংহার-শাসন নিপীড়ন চলতেই থাকবে। স্বাভাবিকভাবে, তখন আমরা ২৩৫ ওরা ৩০ বা 'They have been paid back in their same coin'-এর মতো দম্ভোক্তি শুনবো না মুখ্যমন্ত্রীর মুখে। দুঃখের বিষয়, আজ পশ্চিমবঙ্গের শাসকদের কাছে শাসন তত্ত্ব বা অনুকরণীয় শাসক ব্যক্তিত্ব কোনটাই ভারতের বা ভারতীয় নয়। সেগুলি হয় রাশিয়া-চীন-বা মার্কস-মাও-স্ট্যালিন কেন্দ্রিক আর তাই বাংলার আজ এই দুর্দশা, বাংলার সর্বনাশ।

ভারতের আমরা, যারা বিবেকানন্দ—গান্ধীতে বিশ্বাসী তারা মনে করি মানুষ পাল্টালে সমাজ পাল্টাবে। মার্কসবাদী ও পশ্চিমীরা মনে করেন, সমাজ পাল্টালে মানুষ পাল্টায়। অর্থাৎ প্রথমটা বাইরে ও ভেতরে দুটোই নিয়ে। কিন্তু দ্বিতীয়টা শুধু বাইরে নিয়ে। দ্বিতীয়টা দেহ বুদ্ধি বা 'সেন্স' ভিত্তিক। মন ও আত্মা সেখানে গৌণ। প্রথমটাতে কিন্তু দেহ-মন-বুদ্ধি ও আত্মা চারটেই আছে। তবে একটি ব্যাপারে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি এক এবং তাহলো তত্ত্ব ও কাজকে কেউই আলাদা করে দেখে না। কিন্তু আজকে বাংলায় তত্ত্ব বা বিচার ও কাজের মধ্যে প্রতি ক্ষেত্রেই বিস্তর ফারাক থেকে যাচ্ছে। মার্কসবাদীরা তো এই ব্যাপারে এক, একদম অগ্রগণ্য। এই বিষয়ে পাঠকদের অনুরোধ জানাই শ্রী কাশীকান্ত মৈত্রের লেখা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ তত্ত্বে ও প্রয়োগে বইটা পড়তে। রাজনীতিতে হয় অথবা নয়, সাদা বা কালো, এটা বা ওটা এই দৃষ্টিভঙ্গি আজ অচল। তবুও যেহেতু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের অনেক খানা-খন্দ বা বিপদ বাঁচিয়ে চলতে হয়, সেহেতু তাদেরকে এই দুটোর মাঝখানে ধূসর জায়গাগুলো খুঁজে বার করে, ভেবে দেখতে অনুরোধ করব। অর্থাৎ তাদের নিজেদের স্বার্থেই, 'This and that, and that and that' পন্থা অনুসরণ করা দরকার। তবু যে পন্থাই নেওয়া হোক না কেন শুধুমাত্র গদী বাঁচাতে কোনও দিনই যেন আদর্শগত বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট না হয় সেদিকে তাদের নজর দেওয়া দরকার। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য, এক জায়গায় বলেছেন, "We are Marxist, therefore we are pragmatist and since we are practical, we know it is wise to be capitalist at this moment when world is wooing capitalism (Hindusthan Times 16th April, 2006, Page-3)" বুদ্ধ দেববাবুদের তাত্ত্বিক ব্যাপারে এই ডিগবাজী খাওয়া ও পুঁজিবাদকে সমর্থনের কারণ বুঝতে পারছি। কিন্তু তার জন্য পুঁজিপতিদের দালালি করতে হবে? শুধুমাত্র গদি রাখতে? এর কারণ কিন্তু খুঁজে পাচ্ছি না। একটা কারণ অবশ্যই আছে, আর তা হলো তথাকথিত এই কমিউনিস্টদের বেশীর ভাগই আদর্শ কমিউনিস্ট নন। বরং সুবিধাবাদী। তাই, এই সুবিধাবাদীদের হাতে পড়ে পশ্চিমবঙ্গ আজ সাংস্কৃতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও জীবনের নিরাপত্তার দিক থেকে দেউলিয়া হয়ে গেছে। দেউলিয়া হতে হতে তলিয়ে গেছে। এবং আজ এক অদ্ভুত অবক্ষয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে। এর পরিবর্তন চাই। তার জন্য স্ট্যালিনবাদী শাসকদের গণতান্ত্রিক পন্থায় উৎখাত জরুরী। ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন দিয়ে এই পরিবর্তন শুরু হয়েছে রাজনৈতিক স্তরে। ২০০৯ এর লোকসভার নির্বাচন, ২০১০ এর ৮০টি পৌরসভার নির্বাচনে মানুষ ভোট দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে তারা পরিবর্তনপন্থী। তাই ২০১১-তে যে নির্বাচন হবে, তা এই রাজনৈতিক শোষণের এক সমাপ্তির ইঙ্গিত প্রথম পর্যায়ে বয়ে আনছে।

পরিশেষে বলতে চাই যে আজকের সিপিএম এর মতো, বৃটিশ শাসকেরাও সেদিন অত্যাচার চালিয়েছিল। ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া লাগিয়ে দিয়েছিল। জমিদার-লেঠেল-পুলিশ দিয়ে মানুষকে ঠেঙিয়েছিল। যা এখন পার্টি ক্যাডার ও পার্টি অনুগত পুলিশরা করছে। বৃটিশরা মন্বন্তর সৃষ্টি করেছিল, আর আজকের শাসকরাও মানুষকে ক্ষুধার্ত রেখে, অনুন্নত রেখে, ক্ষমতা কায়েম রাখার চেষ্টা করছে। বৃটিশ শাসকের এই ব্যবহারে তবু কিছুটা সান্ত্বনা পাওয়া যায়, কারণ তারা ছিল বিদেশী। কিন্তু আজ যদি স্বদেশী শাসকরা রাজনৈতিক রং দেখে মানুষের কল্যাণের কথা ভাবেন, শুধু দল আর গদির স্বার্থে তাদের সামনে বিভীষিকা হয়ে ওঠেন, তবে তার থেকে দুর্ভাগ্যের আর কিছু হতে পারে কি? পশ্চিমবঙ্গের এই সার্বিক অবক্ষয় রুখতে এই সব ছোট মাপের শাসকদের সরাতেই হবে। শুধু কেন্দ্র বা শুধু রাজনৈতিক দল তা করতে পারবেন না। তাদের পেছনে পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও সুশীল সমাজকেও এগিয়ে আসতে হবে। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে, তাদেরকে দধিচীর অস্ত্র হতে হবে। তবেই কিন্তু সমকালীন বঙ্গসমাজ নতুন দিকের সূচনা করতে পারবে। মানুষকে বৃটিশদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিতে হয়েছিল, কিন্তু এই ছোট মাপের শাসকদের হাটাতে জনরোষকেই খড়্গ করে তোলার অঙ্গীকার নিতে হবে। আর সেই নতুন লড়াইয়ের জন্য মন্ত্র হবে সেই পুরানো মন্ত্র 'বন্দেমাতরম' এবং আর নতুন অস্ত্র হবে, 'ব্যালট'।

শব্দরূপ - ৫৬০

কমলিকা সাহা

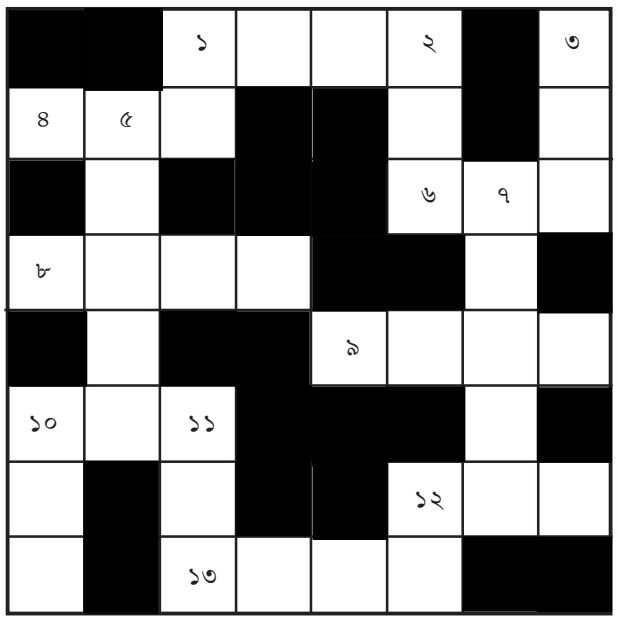

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. প্রথম দুয়ে ময়দার এক মিঠাই, শেষ দুয়ে দৈত্য আসলে শিবের পরিধেয়, ৪. ব্রহ্মার মানসপুত্র, শেষ দুয়ে খারিজ, ৬. লেবু সমার্থে দশমহাবিদ্যার অন্যতম, ৮. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'বণিক' খণ্ডের নায়ক এই সদাগর, প্রথম দুয়ে অর্থ, ৯. তত্ত্বদর্শিনী নারী, গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর কন্যা, একে-তিনে নোংরা, দুয়ে কাটারি, ১০. সোনা সমার্থে বরাহদেব ও পৃথিবীর মহাবল পুত্র, ১২. অর্জুনের ধনুক, ১৩. দশ মস্তকবিশিষ্ট রাক্ষসরাজ রাবণ।

উপর-নীচ ঃ ১. প্রতি শব্দে বিষ বা ব্যাধি, ২. পাপীদের মৃত্যুর পরে শাস্তিভোগের স্থান, ৩. রামায়ণে ইন্দ্রজিতের পত্নী, ৫. রামচন্দ্র, শেষ তিনে পুত্র, ৭. দুর্গা, প্রথম তিনে সপ্তাহের একটি বার বিশেষ, ১০. এক মহাকায় দণ্ডকারণ্যবাসী রাক্ষস, এঁর নাম দনু, শেষ দুয়ে বাঁধন, ১১. বৈশেষিক দর্শন প্রণেতা মুনি, এঁর অপর নাম উলুক, প্রথম দুয়ে অতি সূক্ষ্ম অংশ, ১২. কণ্ঠসংগীত।

● ৫৬০ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১০ সংখ্যায়

এজেন্টদের জন্য

অন্তত পাঁচ কপির কম স্বস্তিকার এজেন্সী দেওয়া হয় না। প্রতি কপি স্বস্তিকার জন্য ১৫.০০ টাকা করে অগ্রিম জমা অবশ্যই রাখতে হবে।

প্রতি মাসের বিলের পাওনা টাকা অবশ্যই পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা প্রয়োজন। অন্যথায় এজেন্সী বাতিল হতে পারে।

স্বস্তিকা ডাক, রেল ও সড়ক পরিবহন দ্বারা পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। ২৫ কপির কম পত্রিকা রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পাঠানো হবে না। রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পত্রিকা নিতে ইচ্ছুক এজেন্টকে নিকটবর্তী রেল স্টেশনের নাম বা পরিবহন সংস্থার নাম, ঠিকানা (পিন সহ) এবং ফোন নম্বর (যদি থাকে) জানাতে হবে।

নতুন এজেন্ট হলে অগ্রিম জমা টাকা সমেত সম্পূর্ণ নাম ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার।

আরও বিস্তারিত জানতে স্বস্তিকা দপ্তরে পত্রালাপ করুন। — ব্যবস্থাপক

বঙ্গমাতা অনেক রত্ন প্রসব করেছেন : মল-মূত্রও ত্যাগ করেছেন

শিবাজী গুপ্ত

রত্নপ্রসূতা বঙ্গভূমি। গোটা উনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদ পর্যন্ত রত্ন প্রসব করতে করতে প্রসবে ক্ষান্তি দিয়েছেন। কিন্তু মলমূত্র ত্যাগ তো বন্ধ করতে পারেননি। সেসব ডাঁই হয়ে পচেছে। তাতে জন্ম নিয়েছে অসংখ্য কৃমি-কীট। ছড়িয়েছে পরিবেশ দূষণকারী উৎকট দুর্গন্ধ।

এই কৃমি-কীটগুলিই বাংলার বুকে চষে বেড়াচ্ছে। আকৃতিতে মনুষ্যরূপী হলেও প্রকৃতিতে কৃমি-কীটের স্বভাব পুরোপুরি বর্তমান। দুর্গন্ধে এদের ধারে কাছে ঘেঁষা দুঃসাধ্য। পোষাক-আষাকে মাকাল হলেও ভেতরটা কালো কুৎসিত। এরা যেন জঙ্গলের বিছুটি লতা, গায়ে লাগলেই চুলকোয়, অথচ এমনই সমাজ-ব্যবস্থা যে এদের কাছে না গিয়ে উপায় নেই।

রামপ্রসাদ গেয়েছেন— ''মা হওয়া কি মুখের কথা!'' দেশবাসী মনে মনে বলছে, ''নেতা হওয়া কি সুখের কথা!'' হাটে-বাজারে পথেঘাটে অলিগলিতে এতো নেতা ফলছে যে তা আর কহতব্য নয়। কে নেতা নয়? বাপ নেতা, মা নেতা, স্বামী নেতা, স্ত্রী নেতা, পুত্র নেতা, কন্যা নেতা, শ্বশুর নেতা, শাশুড়ী নেতা, দাদা নেতা, বৌদি নেতা, ভাই নেতা, বোন নেতা, শ্রমিক নেতা, দোকানদার নেতা, খদ্দের নেতা, বাড়িওয়ালা নেতা, ভাড়াটিয়া নেতা, শিক্ষক নেতা, ছাত্র নেতা, গুরু নেতা, শিষ্য নেতা—এক কথায় ''আমরা সবাই নেতা আমাদের এই নেতার রাজত্বে।''

পরাধীন দেশে সাধারণ মানুষ দুই শ্রেণীর লোকের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হোত— জমিদার ও মহাজন। কিন্তু জমিদারের খাজনা মিটিয়ে দিলে এবং নিয়মিত মহাজনের ঋণের টাকার সুদ শোধ করলে আর তেমন কোনও উপদ্রবের সম্মুখীন হতে হোত না। কিন্তু স্বাধীন দেশে জনজীবনকে অস্থির অশান্ত উত্যক্ত ও ব্যতিব্যস্ত করার জন্য নানা নামে কত ধরনের সরকারি চর, অনুচর, খেচর, ভূচর, জলচর, স্থলচর, উভচর, নভোচর সৃষ্টি হয়েছে, যাদের চারণক্ষেত্র ভাতের হাঁড়ি থেকে শ্মশানের চুল্লী পর্যন্ত ছড়িয়েছে। এদের প্রতাপ প্রতিপত্তি ক্ষমতামত্ততা, ঔদ্ধত্য, দম্ভ, অহমিকা আত্মম্ভরিতা, অপূরণীয় লিপ্সা অসীম আকাঙ্ক্ষা ও অতৃপ্ত লোভের লকলকে জিহ্বার পরিচয় দিনেরাতে আমাদের দেখতে হচ্ছে, পরিচয় পেতে হচ্ছে।

ইংরেজ শাসনের সুফলরূপে যেসব রত্ন বঙ্গমাতার কোল আলোকিত করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উদাহরণ স্বরূপ কয়েকজনের নামোল্লেখ করা যায়। যেমন— রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ (বিবেকানন্দ), আশুতোষ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র, শ্যামাপ্রসাদ প্রমুখ রথী মহারথীবৃন্দ।

আর স্বদেশী শাসনের কুফলরূপে যেসব ঝুটা ও নকল রত্ন বঙ্গমাতার মুখ কালো করছে তারা গুণে নগণ্য, কিন্তু সংখ্যায় অগণ্য। রাত পোহালেই দুর্ভাগ্যবশত তাদের কালামুখ আমাদের দেখতে হচ্ছে, তাদের কুমূর্তি দেখতে হচ্ছে, কুকথা শুনতে হচ্ছে, কুসঙ্গে চলতে হচ্ছে, কুকর্মের সঙ্গী হতে হচ্ছে। বললাম তো এরা ভাতের হাঁড়ি থেকে শ্মশানের চুল্লী পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। এদের হাত থেকে রেহাই নেই। এদের নামোল্লেখ করা বিপজ্জনক, তাহলে লেখকের নামের আগে চন্দ্রবিন্দু বসাবার ব্যবস্থা করবে, তাই পদোল্লেখেই কাম সারতে হচ্ছে।

> **স্বদেশী শাসনের কুফলরূপে যেসব ঝুটা ও নকল রত্ন বঙ্গমাতার মুখ কালো করছে তারা গুণে নগণ্য, কিন্তু সংখ্যায় অগণ্য। রাত পোহালেই দুর্ভাগ্যবশত তাদের কালামুখ আমাদের দেখতে হচ্ছে, তাদের কুমূর্তি দেখতে হচ্ছে, কুকথা শুনতে হচ্ছে, কুসঙ্গে চলতে হচ্ছে, কুকর্মের সঙ্গী হতে হচ্ছে। বললাম তো এরা ভাতের হাঁড়ি থেকে শ্মশানের চুল্লী পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। এদের হাত থেকে রেহাই নেই। এদের নামোল্লেখ করা বিপজ্জনক, তাহলে লেখকের নামের আগে চন্দ্রবিন্দু বসাবার ব্যবস্থা করবে, তাই পদোল্লেখেই কাম সারতে হচ্ছে।**

এরা হলেন সদস্য, অর্থাৎ দস্য বা দস্যুদের সহোদর। সর্বত্র সশরীরে বর্তমান। কাব্য করে বলতে গেলে ''বহুরূপে সদস্য ছাড়ি কোথায় খুঁজিছ ঈশ্বর?'' এরা কিসের সদস্য নয়? তৃণমূল স্তর থেকেই শুরু করা যাক। এরা গ্রাম-পঞ্চায়েত সদস্য হিসাবে হাঁড়ির খবর নেবে, অঞ্চল পঞ্চায়েত সদস্য হিসাবে নাড়ির খবর নেবে, জেলা পরিষদ সদস্য হিসাবে বাড়ির খবর নেবে। তারপর ক্রমোন্নতি পদোন্নতি পাল্লা দিয়ে চলবে। দস্যুদের সহযোগী হিসাবে বিধানসভার সদস্য, লোকসভার সদস্য, রাজ্যসভার সদস্য ও মন্ত্রীসভার সদস্যে উন্নতি। অর্থাৎ কচুগাছ কাটিতে কাটিতে একেবারে ডাকাতিতে উন্নতি।

শিক্ষাক্ষেত্রে এই সদস্যতার বা সদস্যুতার উপদ্রবও তৃণমূল স্তর থেকেই শুরু। প্রাইমারী শিক্ষক সমিতির সদস্য, মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সদস্য, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সদস্য, কলেজ শিক্ষক সমিতির সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সদস্য, সেনেট সদস্য, সিন্ডিকেট সদস্য, কাউন্সিল সদস্য, বোর্ড সদস্য, ছাত্র ইউনিয়নের সদস্য, কর্মচারী সমিতির সদস্য— সব মিলিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে সদস্য বা সদস্যুর রাজত্বে শিক্ষার বেহাল অবস্থা। একমাত্র শ্রীবৃদ্ধি শিক্ষকদের ঘরে ঘরে টিউটোরিয়াল ক্লাসের।

প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও একই চিত্র। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী সমিতির সদস্য, তৃতীয় বর্গের অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য, কাড়ুদার সমিতির সদস্য, পিয়ন সমিতির সদস্য, দ্বাররক্ষক সমিতির সদস্য, পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন, দারোগা অ্যাসোসিয়েশন, এস পি অ্যাসোসিয়েশন, ডি এস পি অ্যাসোসিয়েশন, আই পি ডি আই জি অ্যাসোসিয়েশন ইত্যাকার ইত্যাদি। পরিণতি— আইন শৃঙ্খলা রসাতলে। রাস্তাঘাটে হাটে বাজারে গেলে তো সদস্যের বড়বাজার দেখা যায়। বাজার কমিটি, দোকানদার সমিতি, ব্যবসায়ী সমিতি, হোলসেলার, রিটেলার, পাইকারী, খুচরা বিক্রেতা সমিতি, ঠেলাগাড়ি ইউনিয়ন, গাড়োয়ান ইউনিয়ন, ট্যাক্সি ইউনিয়ন, বাস ইউনিয়ন, মিনিবাস ইউনিয়ান, মালিক সমিতি, যাত্রী সমিতি, পত্র-পত্রিকা সম্পাদক সাংবাদিকদের সমিতি, যত রকম খেলা ও ক্লাব আছে তাদের সদস্য।

এদিকে ঘরের দিকে তাকালে বাড়িওয়ালা, ভাড়াটিয়া, কর্তা, গিন্নী, চাকরবাকর মজুর মজুর সবারই আলাদা আলাদা সমিতি, মহিলা সমিতি, পুরুষ সমিতি, বালক সমিতি ইত্যাদি নামে সদস্যের ছড়াছড়ি।

তারপর রয়েছে পূজা কমিটি, জয়ন্তী কমিটি, পাড়া কমিটি, বে-পাড়ার মহিলা কমিটি—সবারই সদস্যপদ রয়েছে, এবং কেউ না কেউ তার সদস্যপদে আসীন আছেন। স্কুল কমিটি, কলেজ কমিটি, ডাক্তার সমিতি, বণিকসভা, ধনিকসভা, কৃষক সমিতি, শ্রমিক সমিতি, বেকার সঙ্ঘ, পেনশনভোগী কমিটিও রয়েছে। তদুপরি ঠাকুর-দেবতা, গুরুঠাকুরদের নামে যেসব আশ্রম আছে, তার পরিচালন সমিতি সমূহের সদস্যসংখ্যা তো গুণে শেষ করা যাবে না।

এসব সভা-সমিতি, সঙ্ঘ, মিশন অ্যাসোসিয়েশন, ইউনিয়ন, দল, পার্টি, কমিটি, সোসাইটি, ব্যুরো, সংস্থা, ক্লাব ইত্যাদির সদস্যগণকেই বলা যায় বঙ্গমাতার পচা বর্জ্য থেকে জন্ম নেওয়া মায়ের মুখে কালি লেপনকারী কুপুত্রের দল। ''কুপুত্র হয় শত শত, কুমাতা কেউ হয় না তো''— শতকরা একশো ভাগ খাঁটি সত্য।

তোমার চরণ চিহ্ন ধরি

(৯ পাতার পর)

মুক্তি বাহিনীর কমাণ্ডার রাণেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী। ২২ জুন ঢাকা এয়ারপোর্টে দুপুরবেলা নামলেন মাস্টারমশায় ও নরেশদা।

বাংলাদেশের এই চিত্র আমি ''কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী'' স্মরণিকাতে ''অমলিন স্মৃতি রেখা'' শীর্ষক নিবন্ধে বিশদভাবে লিখেছি। সেইজন্য এর দ্বিরুক্তি করব না। এই বাংলাদেশে বংশীদার সাথে থেকে দেখেছি বিদেশমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ, ত্রাণমন্ত্রী কামরুজ্জামান, অর্থমন্ত্রী তাজুদ্দিন, খাদ্য ও বেসরকারী সামরিক বিভাগের মন্ত্রী ফণী মজুমদার, আবদুল হান্নান চৌধুরী। প্রভৃতি ব্যক্তিদের সাথে বংশীদা মিশে গেছেন যেন অন্যরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হয়ে। সব মন্ত্রীরাই বংশীদার ব্যক্তিত্বে মোহিত ছিলেন।একদিকে অপূর্ব সরলতা দিয়ে মিশেছেন অন্যদিকে ত্রাণসামগ্রীর বিতরণ বিষয়ে সবরকম প্রশাসনিক সাহায্য আদায় করে নিয়েছেন। আবার ভারতের সাথে রাষ্ট্রীয় সমাজের ভবিষ্যৎ নিয়েও সুগভীর আলোচনা করেছেন। বংশীদা মুজিবর রহমানের সাথে দেখা করার কর্মসূচী নিয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন বৃটেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্যার আলেক্স ডগলাস হিউমের সাথে বৈঠকের জন্য একদিন পিছিয়ে যায় সেই সাক্ষাৎকার। বংশীদা কিন্তু পরদিন সকালে পূর্ব নির্দ্ধারিত কার্যসূচী অনুসারে যশোর দিয়ে কলকাতা ফিরলেন। কোনও প্রশাসনিক পদের সর্বোচ্চ কর্তার সাথে সাক্ষাতের চাইতে নিজের কর্তব্যকে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন তিনি। বংশীদার পরে যখন রাজনীতিতে গেলেন এবং বিজেপি-র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সচিব ছিলেন তখন কত মন্ত্রী, কত মুখ্যমন্ত্রী, কত রাজ্যপালের সাথে তাঁর নিত্য সম্পর্ক ছিল। এই সব ব্যক্তির প্রশাসনিক পদের কোনও মোহ বংশীদাকে স্পর্শ করেনি। তিনি যেমন ছিলেন— সকলের কাছে অন্তরঙ্গ সেটাই ছিলেন শেষদিন অবধি। সকলের বংশীদা। আপনজন।

ঢাকাতে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম আমরা। পুরোহিত জনার্দন চক্রবর্তী খানসেনাদের হাত থেকে ঢাকেশ্বরী দেবীর মন্দিরের অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়ার কাহিনী শুনিয়েছিলেন। ঢাকেশ্বরী স্বর্ণনির্মিত দুর্গামূর্তি। সতীর একটি পীঠ। আমরা যখন পুজো দিচ্ছিলাম পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করছিলেন। মাস্টারমশায় ধ্যানস্থ হয়ে বসেছিলেন। নরেশদাও তাই। বংশীদাকে দেখলাম ঢাকেশ্বরীর যূপকাষ্ঠ থেকে বেশকিছু মাটি তুলে নিয়ে বড় কাগজে রাখছেন। বিস্মিত হয়ে বললাম, ''বংশীদা, যূপকাষ্ঠের মাটি নিয়ে কি করবেন?'' একটু মাটি আমার কপালে লাগিয়ে দিলেন। বললেন—সঙ্ঘের প্রতিজ্ঞার কার্যক্রমের সময় এই মাটি স্বয়ংসেবকদের কপালে লাগিয়ে বলব খণ্ডিত মাতৃভূমির মর্মবেদনা বোঝাবার চেষ্টা করো— শপথ নাও দেশকে অখণ্ড করার।'' বংশীদার মুখে এক অদ্ভুত দীপ্তি দেখতে পেয়েছিলাম। নির্জন মন্দিরে এক মাতৃসাধক মাতৃভূমির অখণ্ডতার শপথ নেওয়ার জন্য ভাবছেন স্বয়ংসেবকদের কথা।

এখানেই বংশীদার বৈশিষ্ট্য। সর্বত্রই স্বয়ংসেবকদের কথা ভেবে গেছেন। জানি— এ বিশ্বে এক সময় এই নশ্বর শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। স্মৃতিভারে ক্লান্ত মস্তিষ্ক কাজ করে না। কিন্তু হৃদয় দুর্বল হয় না— হৃদয় থাকে সজাগ। সেই সজাগ হৃদয় স্পষ্ট ভাষায় বলে ওঠে— "I took my pen for sword. I now know we are powerless. No matter." দিবসের আলো শেষে অন্ধকার তমিস্রা জীবনকে ঘিরে ধরে— তখনও বংশীদার জন্য বলতে ইচ্ছে করে—

''মৃত্যুকে তুমি উপহাস করে
করেছো জয়
রক্তস্নানের মধ্যে হয়েছে অরুণোদয়।
প্রাণ সমুদ্রে এনেছো বন্যা কি দুর্জয়!
উর্বর ভূমি ছড়ায়েছ বীজ, চেয়ে আছি
মোরা অনিমেষে
হে অশ্বারোহি! রক্তাক্ষরে তোমার শপথ
নিই লিখে।''

মাস্টারদা'র ধলঘাটের রণক্ষেত্র এখন ধূসর স্মৃতি

অরিন্দম মুখার্জী ।। চট্টগ্রামের নাম শুনলেই যে কোনও বাঙালীর মনে প্রথম যাঁর কথা মনে হয় তিনি সূর্য সেন। মনে ভেসে ওঠে কত রোমাঞ্চকর, বীরত্বের, লড়াইয়ের চিত্রাবলী। বাঙলার অন্য পাঁচটা স্থান নামের থেকে চট্টগ্রাম উচ্চারণে দেশবাসীর সম্ভ্রম যে ব্যক্তির কারণে, সেই মাস্টারদা সূর্য সেনকেই তাঁর নিজের শহর আজ মনে হলো ভুলে গেছে। সম্প্রতি আমাদের চট্টগ্রাম ভ্রমণে এমনই উপলব্ধি।

৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশী জাতীয়তাবোধ পাকিস্তানের হাত থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেয়। জন্ম হয় নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের। এ কথা যেমন সত্যি তার সঙ্গে এটাও তো সত্যি— মাস্টারদার মতো অখণ্ডভারতের বীর সেনানীরা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যে লড়াইয়ের পরম্পরা অধুনা বাংলাদেশের মাটিতে সৃষ্টি করেছিল তারই ফলশ্রুতি আজকের এই বাংলাদেশ। ঠিক এই কথাই বলছিলেন পটিয়া অঞ্চলের চারবারের বিজিত চেয়ারম্যান সামসুর আলম— আমরা যখন পটিয়া যাচ্ছিলাম চট্টগ্রাম থেকে। চট্টগ্রাম থেকে পটিয়ার দূরত্ব ৩০ কিলোমিটার। আমাদের গন্তব্য অবশ্য পটিয়া থানার ধলঘাট ইউনিয়নের গৈড়লাগ্রাম। যা মূল রাস্তা থেকে আরও ১৫ কিমি ভিতরে। প্রথম খানিকটা অতিকষ্টে গাড়িতে যাওয়ার পর নেমে হাঁটতে হচ্ছিল। আমাদের সঙ্গে হাঁটছিলেন স্থানীয় কাঠ ব্যবসায়ী মহঃ সেলিমুদ্দিন। নিজে থেকেই বললেন, দেখুন তো আপনারা কত দূর থেকে এখানে এসেছেন, এরকম আরও অনেকে আসে, তবু সরকার এখানে একটা ভাল রাস্তা তৈরি করছে না। মাস্টারদা তো আমাদেরও গর্ব। তাছাড়া এখানে স্থায়ী কিছু করলে আরও বেশী মানুষ আসতে পারে। তখন আমাদের গ্রামের নামও আরও পরিচিত হবে। আমরা যাঁদের বাড়ি যাচ্ছিলাম তাঁদেরই একজন এগিয়ে আমাদের নিতে এসেছিলেন। সেই অশোকবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, ধলঘাটের মাস্টারদার যুদ্ধের কথা আমরা খানিক পড়েছি। কিন্তু আপনার মুখ থেকে কিছু শুনতে চাই।

অশোকবাবু বললেন, আমার ঠাকুমার নাম ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাস। তিনি সেই সময় পলাতক বিপ্লবীদের প্রধান আশ্রয়স্থল ছিলেন। মাস্টারদা আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নেন ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩। কিন্তু এর চারদিন পর এক স্থানীয় মহিলা আমাদের বাড়িতে এসে

মাস্টারদার স্মরণে নির্মিত শহীদবেদীর ভগ্নপ্রায় দশার সামনে সামসুর আলমের সঙ্গে ক্ষীরোদপ্রভার উত্তরসূরীরা।

মাস্টারদা, কল্পনা দত্তদের দেখে ফেলে। তাঁর মাধ্যমেই পুলিশের চর নেত্র সেন খবর পায়। নেত্র সেন পুলিশে খবর দিলে গুর্খা সেনাবাহিনী ১৬ ফেব্রুয়ারি রাতে বাড়ি ঘিরে ফেলে। অসম যুদ্ধে ক্ষীণ স্বাস্থ্য ৩৯ বছরের মাস্টারদা এখান থেকেই গ্রেপ্তার হন। কথা বলতে বলতে পৌঁছে গেলাম আমাদের গন্তব্যস্থলে। অল্প স্বল্প বৃষ্টি হচ্ছিল। যে বাড়ী থেকে মাস্টারদা গ্রেপ্তার হন সে বাড়ি আজ আর নেই। অশোকবাবুরা জানালেন, মাস্টারদাকে গ্রেপ্তারের পর বৃটিশ সৈন্যবাহিনী সে বাড়িটিও ধূলিসাৎ করে দেয়। সে সময়কার বাড়ি মাটির হলেও দোতলা, ১৪ ঘরের ছিল। বর্তমান বাড়ি একতলা, টিনের ছাদ, খুবই করুণ অবস্থা।

অশোকবাবুর এক ভাই দীপকবাবু দেখালেন বাড়ির পাশে ৭০-এর দশকে তৈরি এক ভগ্নপ্রায় শহীদ বেদী। তাঁর কথায় ১৯৭৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ থেকে কোনও এক মন্ত্রী এসে এটি উদ্বোধন করেন। তারপর থেকে বহু মানুষ এখানে এসেছে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কিছু করার। কিন্তু বাস্তবে তার কিছুই হয়নি।

ফিরছিলাম বিপ্লবের পীঠস্থান চট্টগ্রামের গৈড়লাগ্রাম থেকে। সঙ্গে আসা ওই পরিবারেরই কলেজপড়ুয়া নবীন সদস্য সুরজিত বলল, জানেন তো, মাস্টারদাকে না বৃটিশরা এত ভয় পেত যে চট্টগ্রাম জেলে ফাঁসির আগেই মেরে অর্ধমৃত করে দিয়েছিল। আর ওনার ফাঁসির পর সেই দেহ রাতের অন্ধকারে চট্টগ্রামের মাঝ সমুদ্রে জাহাজে করে নিয়ে পাথর বেঁধে ফেলে দেওয়া হয়। এই রকম মানুষটিকে সকলে কি করে ভুলে গেল বলুন তো? আচ্ছা, আমাদের সরকার তো কিছু করছে না, কিন্তু ভারত সরকার! তারা তো কিছু করতে পারে। তারা কেন কিছু করছে না? এ প্রশ্নের উত্তর আমারও জানা নেই। তাই সুরজিতের কথার উত্তরে চুপ করে রইলাম।

ফেরার সময় সামসুর আলমকে জিজ্ঞাসা করলাম, বিশ্বাসঘাতক নেত্র সেনের কি হলো? সামসুর উত্তরে বললেন, কি আর হবে? ৯ জানুয়ারী ১৯৩৪ নেত্র সেনকে আঠারো বছরের স্কুল ছাত্র কিরণ সেন এই গৈড়লা গ্রামেতেই মাস্টারদার ফাঁসির (১২ জানুয়ারী ১৯৩৪) তিন দিন আগে ধারালো কাটারি দিয়ে এক কোপে হত্যা করে। এটাই সান্ত্বনা— মৃত্যুর আগে অন্তত মাস্টারদা সেই বিশ্বাসঘাতকের চরম পরিণতির কথা জানতে পেরেছিলেন।

ঐতিহ্যকে ধরে রেখেও নতুন সাজে

স্বস্তিকা পূজা সংখ্যা - ১৪১৭

বিস্ময়ের বাঙ্ময়

উপন্যাস

● নবকুমার বসু ● সুমিত্রা ঘোষ ● দীপঙ্কর দাস ● বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

গল্প

● গোপালকৃষ্ণ রায় ● এষা দে ● জিষ্ণু বসু ● রমানাথ রায় ● শেখর বসু ● সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত ● বাদল ঘোষ

রম্য রচনা

● চণ্ডী লাহিড়ী

ছড়াকাহিনী

● পতিতপাবন গৌরসুন্দর ঃ শিবাশিস দত্ত

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে।
মূল্য ৪০ টাকা।
সত্বর কপি বুক করুন

প্রবন্ধ

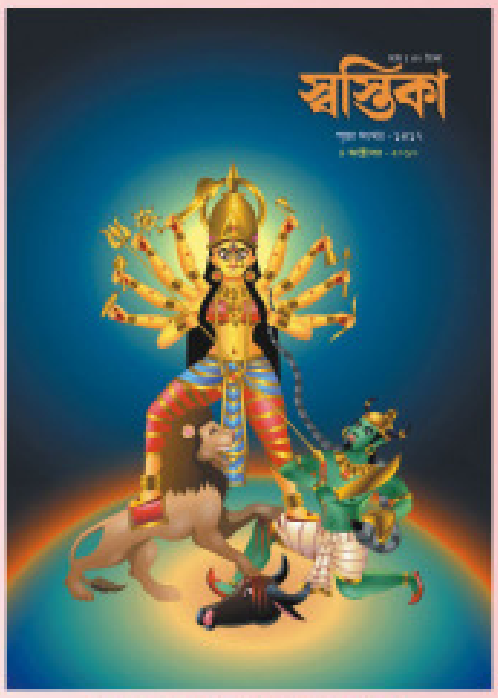

মহাশক্তি মা দুর্গা ● স্বামী বেদানন্দ
হিন্দুত্ব ও ভারতীয় যুবসমাজ ● দত্তাত্রেয় হোসবালে
ভারতের পরমাণু প্রযুক্তির স্থপতি ডঃ হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা ● দেবীপ্রসাদ রায়
ঐতিহ্য ও আধুনিকতার প্রতিমূর্তি ঃ জীবনে ও মননে রমেশচন্দ্র দত্ত ● প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়
অনার কিলিং ঃ মুসলিম দেশে দেশে ● রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী
সেকুলারবাদীরা রবীন্দ্রনাথকে হিন্দুত্ববাদী বলবে না তো! ● দীনেশ চন্দ্র সিংহ
আলোকোদ্ভাসিত তারাশঙ্কর - তাঁর কথাসাহিত্যে ভারত চেতনা ● অচিন্ত্য বিশ্বাস
হরপ্পীয় থেকে ব্রাহ্মী ঃ লিপির বিবর্তন ● সুমিত চক্রবর্তী
উষাকাল থেকে উনিশ শতক ঃ বাংলার ভ্রমণ কথা ● অরিন্দম মুখোপাধ্যায়
চিলেকোঠায় বঙ্গজীবন ও বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ ● অর্ণব নাগ
গৌড়ীয় নৃত্য ● কাবেরী পুইতুণ্ডি কর
সাধনা ও সাধকের আলোকে রবীন্দ্রনাথ ● অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের গান ● সন্দীপ কুমার দাঁ
আম আদমীর দেবতা ● বিজয় আঢ্য

Steelam
EXCLUSIVE FURNITURE

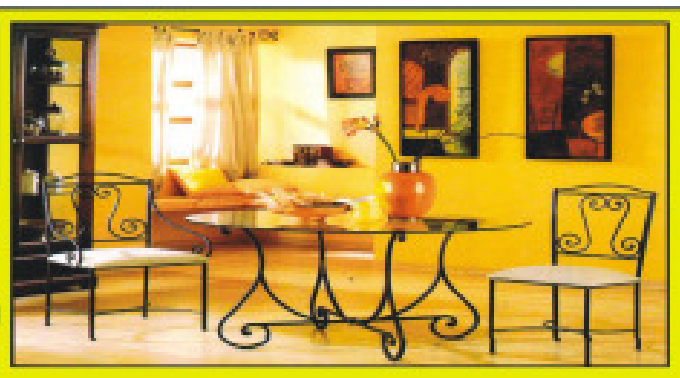

স্টীলম এর ......
পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে
Exclusive Show Room
দেওয়া হইবে॥
Factory :- 9732562101

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক ঃ বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ ঃ সম্পাদকীয় - ৯৮৭৪০৮০৩৪৩, অফিস - ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১, বিজ্ঞাপন - ৯৮৭৪০৮০৩৪২, ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫,
e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com